আমার আত্মকথা

শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ

প্রকাশক—
শ্রীরতিকান্ত নাগ
আর্য্য পাবলিশিং হাউস
কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কালিকাতা।

প্রথম সংস্করণ
পৌষ, ১৩৩৮

দাম দুই টাকা]

শ্রীসরস্বতী প্রেস লিঃ,
প্রিন্টার—শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত
১নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

শ্রীমণীন্দ্রনাথ রায়ের করকমলে—

স্নেহের মণি,

শৈশব থেকে বরোদা জীবন অবধি ঘটনাগুলি এক সঙ্গে সংগ্রহ করে লেখা এই "আমার আত্মকথা" তোমার হাতেই দিলুম। ভবঘুরের শেষ জীবনের তুমি অকৃত্রিম বন্ধু, আমার বড় আদরিণী বোন নির্ম্মালোর তুমি চিরসঙ্গী, তোমাকে অদেয় আর আমার কি থাকতে পারে? তবে মানুষের ধর্ম্ম ও সমাজ যাকে ভাল লোক বলে আমি তা' নই। ভাল-মন্দ, সুন্দর-কুৎসিত, মঙ্গল-বীভৎস এমনি কত রসে ভাবে সরস ছবি যে বিশ্ব-শিল্পী দু'হাতে অম্লান বদনে এঁকে চলেছে; তার সুরে ছন্দে হয়তো আমি তাল কাটিনি, কিন্তু মানুষের মন-গড়া সুরে চলতে গিয়ে পদে পদে তাল কেটে গেছে। সে সব ঘটনার আদ্যোপান্ত খুঁটিয়ে এ আত্মকথায় দেওয়া হয় নি, দেবার নয়ও; আন্দামান থেকে দেশে ফিরে অবধি এই বার বছরের কথা তো আপাততঃ চাপাই রয়ে গেল। সব জানলে কি আর তোমরা এমন আদর ক'রে ঘরে ঠাঁই দেবে? নীতিবাগীশ সামাজিক মানুষের পুঁটি মাছের প্রাণে আর কত সয়?

১৩ অগ্রহায়ণ,
১৩৩৮

তোমার—
বারীন দা'



শ্রীবারীন্দ্র কুমার ঘোষ


Estd:-1919.
MAKARDAH--HOWRAH.

গৌরচন্দ্রিকা

দ্বীপান্তর থেকে ফিরে এসে সংকল্প করেছিলুম আমার বিপ্লব যুগের কাহিনী লিখব তিন ভাগে ; তার সব শেষের ভাগটা— 'দ্বীপান্তরের কথা'ই বেরোয় আগে। তারপর বিজলীতে 'দ্বীপান্তরের পথে' বলে যে ধারাবাহিক ইতিবৃত্ত বের হচ্ছিল সেইটেই শেষটা। আত্মকাহিনী নামে বইএর আকারে বের হয়। তাতে ছিল আমার জীবনের সেই অংশ যা' আরম্ভ হয় মাণিক-তলার বাগানে গুপ্ত সমিতি-স্থাপনার পর গুরু অন্বেষণে গুর্জ্জর অভিমুখে যাত্রায় এবং শেষ হয় এখানকার জেলে বন্দী-জীবন কাল পূর্ণ করে দ্বীপান্তর দণ্ডাদেশে ; তারপর বিজলীতে "বোমার যুগের কথা" শীর্ষক লেখা—আসল বিপ্লব কাহিনীটি বের হতে আরম্ভ হয়। তখন বাঙলার মসনদে রোনাল্ডসে সাহেব বিরাজ করছেন ও সার সুরেন্দ্রনাথ মন্ত্রী হয়েছেন। আমি দ্বীপান্তর থেকে মুক্ত হয়ে দেশে আসার পর চিত্রশিল্পী গগনেন্দ্র ঠাকুরের

কাছে রোনাল্ডসে সাহেব আমার সঙ্গে পরিচয় করবার বাসনা জানান। গগনেন্দ্র ঠাকুর তাঁকে সমবায় ম্যান্‌সনে ভারতীয় চিত্রকলাশালায় নিয়ে আসেন ছবি দেখাবার অছিলায়। সেইখানে আমার সঙ্গে তাঁর দেশের সম্বন্ধে এক ঘণ্টা আলাপ হয়।

যখন বিজলীতে 'বোমার যুগের কথা' বের হতে আরম্ভ হ'লো তখন ভারতে প্রিন্স অব ওয়েলস্ আসছেন, অশান্ত ভারতকে রাজপুত্র দেখিয়ে শান্ত করবার বিরাট আয়োজন চলছে। সার সুরেন্দ্রনাথ সঞ্জীবনী-সম্পাদক শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্রের দ্বারা আমায় ডেকে পাঠিয়ে অনুরোধ করলেন 'বোমার কথা' বন্ধ রাখতে যে পর্য্যন্ত রাজপুত্র বহাল তবিয়তে বাপ মায়ের কোলে ফিরে না যান। আমি বিজলীর পাঠকদের এমন ভাবে প্রতিশ্রুতি দেবার পর বন্ধ রাখতে নারাজ হওয়ায় চতুরচূড়ামণি সুরেন্দ্রনাথ আমায় রোনাল্ডশে সাহেবের শরণাপন্ন হতে উপদেশ দিলেন এবং খুব সম্ভব ভিতরে ভিতরে কলকাটিটিও টিপে রাখলেন। আমি ডাক পেয়ে একদিন লাটভবনে গিয়ে উপস্থিত হই। বাহিরে অপেক্ষা করবার সময় দেখি সার সুরেন্দ্রনাথ কাছাকাছি ঘুরে বেড়াচ্ছেন। রোনাল্ডসে সাহেবের ঘরে আমার ডাক পড়বার পরই সে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ষ্টেট্‌সম্যানের সম্পাদক জোন্স সাহেব। আমি এই অনুরোধের বিরুদ্ধে রোনাল্ডসে সাহেবকে জানাই; বলি, যে, পাঠকদের প্রতিশ্রুতি দিয়ে এখন আর ওটা বন্ধ করা যায় না। লাট সাহেব হেসে বলেন—"গভর্ণমেণ্ট আপনাকে বন্ধ করতে বাধ্য করছেন না, অনুরোধ করছেন মাত্র।" অগত্যা

'বোমার কথা' বন্ধ হয়ে যায় এবং দেশে বোমার সূত্রপাত ও চণ্ডলীলা আবার হওয়ায় আর তা' এ পর্যন্ত বের হয় নি।

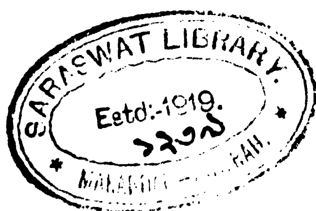
এর আগে আর একটু ঘটনা ঘটে; আমার বিশ্বাস সার সুরেন্দ্র ও রোনাল্ডসে সাহেবের উদ্যোগী হয়ে এ কাহিনীটি বন্ধ করবার মূলে সেই ব্যাপারটিই হেতুরূপে ছিল। বিজলীতে বোমার যুগের কথা বের হবার সময় আমার কোন ইঞ্জিনীয়ার বন্ধুর মারফৎ 'ষ্টেট্সম্যান' আমাকে দশ হাজার টাকা দিতে চান এই কাহিনীর ইংরাজি অনুবাদ তাঁদের কাগজে বার করবার বিনিময়ে। এই সূত্রে পি এন গুহ আমার কাছে আসা যাওয়া করছিলেন। তখন জোন্স সাহেব ষ্টেট্সম্যানের এডিটার। তারা ভারতব্যাপী বিজ্ঞাপন দিয়ে সচিত্র এই কাহিনী বের করবার আয়োজন করছিলেন। আমি প্রথমে রাজি হই, তারপর কয়েকজন দেশপ্রাণ নেতা বিশেষতঃ দেশবন্ধুর অনুরোধে আমার প্রতিশ্রুতি প্রত্যাহার করি। জোন্স সাহেব রেগে বলেছিলেন, "All right, I shall see that it does not see the light of day,"—আমার খুবই বিশ্বাস জোন্স সাহেবের চক্রান্তে ও প্ররোচনায় গভর্ণমেণ্ট আমার কাহিনী বন্ধ করেছিলেন।

জন্ম থেকে বরোদার জীবন অবধি এ জন্মকথা এখনও বলা হয় নি, এ অংশটুকু সেই সময়ের কাহিনী। তারপর 'বোমার যুগের কথা'ও বের করবার ইচ্ছা আছে। দেশে বোমার ব্যাধি সংক্রামক হয়েই আজও টিকে আছে, হয়তো স্বরাজ স্থাপনা অবধি থাকবে। বোমার জন্মদাতা আমার এতদিন পরে এ সম্বন্ধে

কি বলবার আছে, এ বস্তুটি দেশে কি করে এলো, এ সব দেশের মানুষের শোনবার প্রয়োজন আছে বলেই আমার বিশ্বাস।

আমার জীবনের শেষ অংশ সাধন জীবনের কাহিনী, এই সাধন জীবন আরম্ভ হয় সুরাটে লেলের দর্শন থেকে আর শেষ হয় গত ১৯২৯ অব্দের ডিসেম্বর মাসে যখন পণ্ডিচারী শ্রীঅরবিন্দ যোগাশ্রম ছেড়ে বাঙলায় আসি। এ গল্পও খুবই চিত্তাকর্ষক হবে। কেবল এত কথা বলবার জন্যে সামর্থ্য ও পরমায়ুতে কুলবে কি না জানি না।

পারিবারিক জীবনেরও সব ঘটনা প্রকাশ্যে বলা সম্ভব নয়, কারণ—আমার জীবনের গতি চিরদিনই বাঁধা পথের বাইরে চলেছে, আমি স্বভাব-বিদ্রোহী। যাদের নিয়ে এই সব খেলা চলেছিল তাদের অনেকে এখনও জীবিত। তবু যতদূর বলা যায় সবই অকপটে বলবো, নিজেকে চুণ-কাম করে সাদা দেখাবার কোন প্রয়াসই এতে থাকবে না। আমি নীতিশাস্ত্রটা একটা উপসর্গ বলে মনে করি, শক্তিমানের জন্যে ও-শাস্ত্রটা আদৌ নয়, আর লোকমতের ভয় আমার কাছে বড় হীনতার ও লজ্জার কথা মনে হয়। লোকের আমি ধারি কি? যারা পরের বিচার করে তারা নিজেরা ক'জন নিখুঁৎ? নিজের পাপটি লুকিয়ে মানুষ পরের ঠিক সেই পাপেরই সাজা দিতে উদ্যত হয়, এই তো সর্ব্বত্র দেখে আসছি। যার সতীত্বের বড় জাঁক ও আড়ম্বর সে হচ্ছে চিরদিনই সব জায়গায় দীঘল-ঘোমটা নারী।


SARASWAT LIBRARY
Eetd:-1919.
১২৩৯
MALAMUK ... RAH.

আমার আত্মকথা

এক

আত্মকাহিনী লিখেছিলাম আন্দামান থেকে ফিরে। তাতে শৈশব ও কৈশোরের দিকটি আদৌ লেখা হয় নি। এখন যা লিখতে বসেছি তা হচ্ছে জন্ম থেকে বরোদা জীবন অবধি ঘটনা। সে সবের একেবারে নিখুঁৎ চিত্র ও সঠিক বিবরণ দেওয়াও শক্ত; তার প্রথম বাধা আমার ক্ষীণ স্মৃতি-শক্তি। ঘটনা-বহুল বিচিত্র আমার জীবনে ছায়াচিত্রের মত কত ছবি যে উপর্যুপরি এসেছে ও গেছে, তাদের আগের গুলিকে কতক অস্ফুট করে, কিছু বা মুছে দিয়ে। স্মৃতির দড়িতে জটের ওপর জট পাকিয়ে ক্রীড়ারত শিশু মহাকাল আজ এমন এককাণ্ড করে বসেছে, যে, সে জট আর ছাড়ানো অসম্ভব। তার পর জীবনের শৈশব কৈশোর ও যৌবনের রঙ্গমঞ্চে অন্তরাল থেকে কত মানুষ দলের পর দলে এসে ঢুকেছে আর বেরিয়ে গেছে

তাদের ভূমিকা অভিনয় করে, হাসিয়ে কাঁদিয়ে, আনন্দের হাট বসিয়ে, করুণ রসের অশ্রুতে তার তখনকার আকাশ বাতাস ভিজিয়ে; সেই সব দলের অনেকেই আর ইহ-জগতে নেই —বিশেষ করে গোড়ার শৈশব ও কৈশোরের মানুষ-গুলি। তাঁরা সব আজ আমার চারদিকে ঘিরে থাকলে হতো ভাল, আমার ক্ষীণ স্মৃতির তাঁরা খোরাক জোগাতেন, তার বিলুপ্ত মোছা পাতাগুলি নিজেদের ভাণ্ডার থেকে ভরে তুলতেন কত না চিত্তাকর্ষক দ্রব্য-সম্ভারে।

যাই হোক, বলতে যখন বসেছি তখন এ গল্প আমাকে বলতেই হবে। আমার মনে হয় উঁচু ধরণের কবিতা বা ছবির মত গল্পও যদি হয় আধখানা ব্যক্ত এবং আধখানা অব্যক্ত, খানিকটা যার চোখের সামনে ভাসছে রূপে রঙে রেখায় আর খানিকটা পিছনে ফুট-ফুট হয়ে সারা চিত্রখানাকে রহস্যে করে রেখেছে থমথমে, তা' হলে সেই গল্পই জমে ভাল। সবটাই যদি খুঁটিয়ে যথাযথ ফুটয়ে তুললুম তা' হলে সে তো হ'লো ফটোগ্রাফ প্রকৃতির হুবহু অনুকরণ; হাজার ভাল হলেও তা কখন সৃষ্টি নয়, তা'তে আর্টও নেই, প্রাণও নেই— যেমন গ্রামোফোনের গান।

খুব আগেকার—প্রায় শৈশব-ঘেষা কথা বলতে গেলে বেশি যে কিছু বলতে পারবো তা মনে হয় না। আমাদের পৈতৃক বাস কোন্নগরে, সে ভিটা শুনেছি এখনও আছে, তবে আমি কখনো চোখে দেখি নি। আমার ঠাকুরদা'র মৃত্যুর

পরে বাবা ও কাকা নিজের নিজের কর্ম্মক্ষেত্রে চলে গেলে ঠাকুরমা কাশীবাস করেন; সেই থেকে কোন্নগরের বাস আমাদের উঠলো। অবোধ শৈশবের সেই অজ্ঞানের কুহেলী ভেদ করে প্রথম যখন জগত আমার অনভ্যস্ত শিশুচো'খে রূপ নিতে লাগল, স্মৃতির সাদা পাতাগুলিতে প্রথম যে ক'টির কালির আঁচড় পড়লো তা'তে চোখের ওপর খুব পুরাণ অস্পষ্ট ফটোর মত জাগে একখানা বাংলো ফ্যাসানের বাড়ী; সামনে রেল লাইন, এখানে ওখানে কালো কালো পাথর, তার ওপর কোঁকড়ানো কোঁকড়ানো হাতাজুড়ি ফার্ণ, দূরে আকাশের গায় নীল পর্ব্বত-মালা, পূবে আর পশ্চিমে—একদিকে ত্রিকূট আর একদিকে দিগড়িয়া। বাড়ীখানি ছিল এক সাহেবের, বাবা সেখানি ভাড়া নিয়ে আমার পাগলী মাকে সেখানে রেখেছিলেন। স্থানটি রোহিণী গ্রাম, দেওঘর থেকে দু'মাইল দূরে। রোহিণীতে মাকে রাখার কারণ বোধহয় এই যে, তার কাছেই দেওঘরে দাদাবাবু (মাতামহ) শ্রীরাজনারায়ণ বসুর বাড়ী। তাঁরা সময়ে অসময়ে তাঁদের পাগলী মেয়েকে দেখবেন।

আমার বাবা ডাক্তার কে ডি ঘোষ (কৃষ্ণধন ঘোষ) ছিলেন পূরো দস্তুর সাহেব, থাকতেনও সেই ষ্টাইলে। বড় বাড়ী, খানসামা, বাবুর্চ্চি, বয়, আয়া, আসবাব-পত্র কোন অনুষ্ঠানেরই ত্রুটি ছিল না। এখনও এই রোহিণীর বাড়ীর বাবুর্চ্চিখানাটা আমার লুব্ধ মনের স্মৃতিতে জল জল করছে, বোধ হয় অনেক কাটলেট চপ অমলেটেরই রস ওটাকে করে রেখেছে আজও অমন

উজ্জ্বল ও ঘোরাল। নিজকে আমার মনে আছে—এই বয়সে নিকার-বকার পরা রোগা ছোট্ট ছেলে। দিদিও (শ্রীসরোজিনী ঘোষ) সঙ্গে ছিলেন আমার নিত্য-সঙ্গিনী খেলার সাথী হয়ে; পিঠোপিঠি বলে আমরা ঝগড়া করতাম বিস্তর কিন্তু একজনকে না হ'লেও আর একজনের এক দণ্ড চলতো না। এই বাড়ীতে কাটানো শৈশবের অংশটুকুর সব কিছুই ভুলে গেছি, একটি তুচ্ছ ঘটনা ছাড়া। একদিন একজন খানসামার সহিত খেলতে খেলতে তাকে ঢিল ছুড়ে মেরেছিলুম। সে নাকে ঝুঁজিয়ে পড়া রক্ত মুছতে মুছতে ভয় দেখিয়েছিল মেম সাহেবকে (মাকে) বলে দেবে বলে। বোধ হয় শিশুর কোমল প্রাণে সেই মার খাবার আতঙ্কের স্মৃতি দুরপনেয় হয়ে মনের পটে বসে গেছিল বলেই আজও চিত্রটি টিঁকে আছে।

আমাদের জীবনে যত ঘটনা ঘটে তাকে বাটালী দিয়ে কুঁদে গভীর করে দেয় কারা জানো? যাদের জগতে বড়ই বদনাম সেই ভৎর্সিত লাঞ্ছিত কাম ক্রোধ লোভ আদি ছয়টি রিপু। আসলে বোধ হয় ওরা আমাদের রিপুর চেয়ে বন্ধু, সচিব সখী ও গৃহিণীই বেশী। আগেই বলেছি সেটা ছিল সাহেবের বাড়ী। সাহেব তখন সপরিবারে ছিলেন বিলেতে আর তাঁর অনেক আসবাব পত্র নীচের তলায় সামনের ঘরটায় ছিল সাজানো। খুব বড় একটা টেবিলে (বোধ হয়, বিলিয়ার্ড টেবিল) বেলোয়ারী কাচের, পেতলের ও সোণার মত ঝকঝকে রঙীন কত কি যে ছিল একটি সাজানো মনোহারী দোকানের মত। রহস্যে অভি-

নবত্বে মাধুর্য্যে সেগুলো আমার শিশুচিত্তকে টানতো যাদুঘরের অপূর্ব্ব সাজ সরঞ্জামের মত, ভানুমতীর ভেল্কির ঝাঁপীর মত। মা যখন দুপুর বেলা ঘুমোতেন তখন তার দু' একটা ভেঙে নিয়ে আত্মসাৎ করে কি আনন্দই যে হতো সে আজ আর বলে বোঝাবার নয়।

কবে যে আমরা এই বাড়ী ছেড়ে লালা তারিণীপ্রসাদের বাড়ীতে এলাম তা' আমার এখন আর স্মরণ নেই। শুনেছি প্রথম যৌবনে মা আমার ছিলেন ডাকসাইটে রূপসী, মা ও বাবার মিলন ছিল গভীর প্রেমের মিলন। সেই প্রেমে ক্রমে ক্রমে চিড় খেয়ে গেল—মা দাদার জন্মের পর শনৈঃ শনৈঃ পাগল হতে লাগলেন। তবু বাবার সে ভালবাসা আমার পাগলী মাকে আরও অনেক দিন ঘিরে রেখেছিল—সযত্ন বাহুর বন্ধনে। আমরা চার ভাই ও এক বোন, বড় শ্রীবিনয়ভূষণ ঘোষ, মেজ শ্রীমনোমোহন ঘোষ, সেজ শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ, তার পরেই দিদি সরোজিনী ঘোষ, এবং সব শেষে সর্ব্বকনিষ্ঠ আমি। আর একটি ভাই শ্রীঅরবিন্দের পর জন্ম নিয়ে মারা যায়; সে যে কেন এসেছিল, কেনই বা একটা উঁকি দিয়ে অমন করে কোন্ অচিন জগতের উদ্দেশে চলে গেল তা বলা কঠিন। কে বা জানে এই জন্ম ও মরণের অতল রহস্য, মানুষের বুদ্ধির মাপ জোকে তার কোন হিসাব হদিস আছে কি না সন্দেহ।

মায়ের প্রতি বাবার ভালবাসার অমন প্রবল নদীতে ঠিক কবে থেকে যে ভাটা পড়লো সে ইতিহাস আমার অজ্ঞাত;

মানুষের হৃদয়ের কাহিনী চির দিনই গোপন-পুরীর কথা, ক'জন তার দুয়ার খুলে জগতের রূঢ় কৌতূহলী চোখের উপর ধরতে পেরেছে? মায়ের এমন করে পাগল হওয়ায় বাবা যে খুব ব্যথা পেয়েছিলেন, আর সেই মর্ম্মন্তুদ দুঃখ ভোলার জন্যেই মদ খাওয়া ধরেছিলেন তা আমার দিদিমার (শ্রীমতী নিস্তারিণী বসু) মুখে শুনেছি। অত বড় ঋষিতুল্য রাজনারায়ণ বসুও যৌবনে মদ গরু খেতেন—সে সময়টাই ছিল ঐ রকম—সাহেব-ঘেষা যুগ! পাশ্চাত্যের মৌতো-গোরী নেশায় সবাই তখন পাগল ও উন্মার্গগামী। প্রথম ইংরাজি শিক্ষার আবহাওয়া, হিন্দু-সমাজের গোঁড়ামীর বিরুদ্ধে প্রথম তরুণ মনের অভিযান, অধঃপতিত দেশের চোখে পাশ্চাত্যের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্য-কলার প্রথম তীব্র জ্যোতিঃ—তখন কি পা•সামলে হিসাব করে চলার কাল? আর অতশত হিসাব যারা করে জীবনের পথে তারা চলে না আদৌ, তারা পিতৃ-পিতামহের ভূপর্য্যটনের, দিগ্বিজয়ের ও দুর্গম স্বর্গারোহণের ফল বসে বসে ভাঙিয়ে খায় আর বৃথা গর্ব্ব ও আস্ফালন করে ব্যর্থ দিনগুলো কাটায়। মদ খাওয়া বা উচ্ছৃঙ্খল হওয়া ওগুলো হচ্ছে মানুষের জীবনের মাত্রা, খুব মারাত্মক একটা কিছুই এসব নয়, মানুষের নৈতিক শুচিবায়ুই এ সবকে এমন ভীষণ করে তুলেছে।

দাদাবাবু বলতেন বাবা ছিলেন আদর্শ চরিত্রের ছেলে, ধর্ম্মে তাঁর ছিল খুব টান, তাঁর ছেঁড়া-খোঁড়া কাগজের মাঝে

এই সেদিন অবধি তাঁর রচিত ভক্তি গদগদ শ্যামা-সঙ্গীত আমি দেখেছি। হিন্দুর ঘরে জন্মেও মাকে আমার একান্তই খুব ভালবেসে বাবা ব্রাহ্ম-পরিবারে বিয়ে করেছিলেন। আমার ঠাকুরমা অতিবড় গোঁড়া নিষ্ঠাবতী মেয়ে ছিলেন বলে তাঁকে লুকিয়েই এই বিধর্ম্মী বিয়ে বাবাকে করতে হয়েছিল। কাকা শ্রীবামাচরণ ঘোষ কেবল দাদার এই কাণ্ডটার খবর রাখতেন, হয়তো উদ্যোগ আয়োজন করে সাহায্যও করেছিলেন। তার পর ঠাকুরমা যখন জানতে পারলেন তখন কাকাকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এই বলে, যে, "ঐ ভাইয়ের হয়ে তুই যেমন আমাকে ঠকালি তেমনি ঐ ভাইয়ের তুই হবি চক্ষুশূল।" কয়েক মাস যেতে না যেতে এই ভীষণ অভিশাপ ফলেছিল। কি সূত্রে জানি নে, বাবাতে ও কাকাতে মনান্তর হয় এবং বাবার জীবিতকাল অবধি তাঁদের মুখ দেখাদেখি ছিল না। বাবা মারা যাবার পর কাকা যখন আমাদের গোমেস লেনের বাড়ীতে দেখা করতে এলেন তখনই আমরা জানতে পারলাম যে আমাদের কাকা বলে কেউ একজন এই ধরাধামে আছে।

মানুষ একটা অসীম অতল ওতপ্রোত বিরাজিত শক্তির সমুদ্রে বাস করছে, সেই শক্তিতেই তার জন্ম, তার গতিবিধি ও তার লয়। কৌশলটি জানা থাকলে স্বেচ্ছামত সেই শক্তি-সমুদ্র থেকে সে অজস্র শক্তি নিতে ও বিকীরণ করতে পারে। আমরা সারা জীবন সজ্ঞানে নয় কিন্তু অজ্ঞানে করছিও তাই, আমাদের বাসনা কামনা হচ্ছে সেই শক্তি টানবার—আকর্ষণ করে নিজের

নিজের আধারে নামাবার একরকম কাঁচা ও নিরেট কৌশল। এর পাকা ও উত্তম উপায়টি জানে যোগীরা যারা শান্ত হয়ে পিছনের সেই পরম সত্যের সঙ্গে এক হয়ে truer harmony of life জীবনের প্রকৃত ছন্দে পৌছেছে! আমাদের মা বাপ বা অতিবড় আত্মজনের অভিশাপ বা আশীর্ব্বাদ যে কখন কখন আশ্চর্য্য রকম ফলে যায় তার কারণই ঐ পিছনের শক্তি; সেই শক্তিকে হৃদয়ের প্রবল ভাবের জোরে তাঁরা টেনে আধারে নামান এবং হাতের অস্ত্রের মত প্রয়োগ করেন,—কখন কল্যাণ কামনায়, কখন অকল্যাণ কামনায়। অসি নিয়ে আমরা যেমন আর্ত্তত্রাণও করি আবার নরহত্যাও করি।

আমার অর্থ হোক, সন্তানের রোগ সারুক, অমুক কাজটা উদ্ধার হোক এই যে সব বিচিত্র কামনা আমাদের মনে ও প্রাণে নিরন্তর আসছে ও যাচ্ছে, সাংসারিক জীবন এইতেই চলেছে। খুব নিরেট অসম্পূর্ণ উপায় হলেও বাসনাই মানুষের আপাততঃ জীবন চালাবার একমাত্র উপায়, where there is a will there is a way,—সংকল্প মনে ও প্রাণে দানা বাঁধলেই উপায় একটা না একটা আপনিই আসে। চাইবার ব্যাকুলতা, অধীরতা, ছটফটানী যেমন শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করে তার জোরে কামনার পিছনের ইচ্ছাশক্তিটিকে অনেকখানি ব্যাহত করে, বিক্ষিপ্ত করে, লক্ষ্যভ্রষ্ট করে, নইলে শান্ত ভাবে চাইতে জানলে মানুষের ইচ্ছাশক্তি হ'তো অমোঘ সর্ব্বার্থসাধিকা। শ্রীঅরবিন্দ যে মানব আধারে দেবজীবনের কথা বলেন তার মূল কথাই

এই ইচ্ছাশক্তির বিশুদ্ধ, শান্ত ও বিরাট রূপ এবং তার অমোঘ প্রয়োগ। মন প্রাণ বিশুদ্ধ ও শান্ত হয়ে যতই উর্দ্ধের বৃহৎ সত্তার সঙ্গে tuned হয় ততই তারা হয় অভ্রান্ত ও অব্যর্থ, ততই পিছনের দেবসত্তা—(মানুষ যার ছায়া) জীবনের হয় কর্ণধার। এ সম্বন্ধে বিস্তৃত করে লেখবার ইচ্ছা রইল সাধন জীবনের ইতিহাসে, সামর্থ্যে ও পরমায়ুতে ও অবসরে যদি কুলোয় তা' হলে একদিন এ ইচ্ছাটিও পূর্ণ হবে।

যাই হোক, ঠাকুরমার অভিশাপ ফললো। বাবা গেলেন নিজের কর্ম্মস্থলে, কাকা গেলেন ভাগলপুরে কমিশনারের হেড ক্লার্ক হয়ে। জীবনের শেষ অবধি তিনি ভাগলপুরেই ছিলেন। তাঁর অনেকগুলি মেয়ে, তাঁদের সন্ধান আমি—গৃহহারা লক্ষীছাড়া সংসারসম্পর্কহীন আমি এক রকম রাখিনে, একথা বলাই বাহুল্য।

বাবা প্রথমে ছিলেন রংপুরের এসিষ্টাণ্ট সার্জ্জন। যে বছর কেশব সেন, বি দে প্রভৃতি বড় বড় একদল বাঙালী জাহাজে চড়ে বিলেতে যান সেই বছর তাঁদের সঙ্গে গেছিলেন এই রংপুরের ডাক্তারটি, এবাডিনের যুনিভারসিটিতে তিনি এম্ ডি পাশ করে হয়ে এলেন পূরো দস্তর সিভিল সার্জ্জন। বাবার এই প্রথম বিলাত যাত্রার সময় তাঁর দুই সন্তান মাত্র হয়েছে—দাদা ও মেজদা, এই দুই ছেলে ও মাকে নিজের বন্ধু মিস্ পিগটের কাছে রেখে তাঁর এই নীল সমুদ্রে ভাগ্যান্বেষণে প্রথম পাড়ি জমানো। পূরো মাত্রায় সাহেব ডাক্তার হয়ে ফিরে এসে কিছু দিন তিনি ভাগলপুরের সিভিল সার্জ্জন হন, তার পরে আসেন রংপুরে।

এখানে তাঁর অনেক বৎসর কাটে। রংপুরে তাঁর এত ক্ষমতা ও ও জনপ্রিয়তা হয়েছিল যে একটি সমগ্র জেলার এই হর্তা কর্তা বিধাতাটিকে জেলার সর্ব্বময় অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হতে দেখে গভর্ণমেণ্ট ভয় পেয়ে যান এবং তাঁকে কিছুদিনের জন্যে ভাগলপুরে বদলী করে তার পর খুলনায় সিভিল সার্জ্জন করে পাঠান। শ্যামবর্ণ, আকর্ণবিস্তৃত চোখ, সৌম্যদর্শন এই মানুষটি শীঘ্রই খুলনারও হয়ে উঠলেন প্রাণ। সেখানকার পুলিশ ম্যাজিষ্ট্রেট, স্কুল, জমিদার, আমলা, প্রজা কারুর ডাক্তার কে ডি ঘোষকে বিনা এক দিনও চলতো না। ম্যালেরিয়া-প্রধান খুলনাকে ম্যালেরিয়াশূন্য করে হাসপাতাল, স্কুল, মিউনিসিপ্যালিটি সমস্ত নিজের হাতে গড়ে এই মুকুটহীন রাজা বহু বৎসর খুলনায় রাজত্ব করেছিলেন। আজও খুলনা বা রংপুরবাসী তাঁকে ও তাঁর কীর্ত্তি কলাপকে ভোলে নি।

বাবা দ্বিতীয়বার বিলাত যান তাঁর তিন ছেলে, এক মেয়ে ও আমার মাকে নিয়ে, শিক্ষার জন্য ছেলেদের সেখানে রেখে আসবার উদ্দেশ্যে। আমাকে গর্ভে নিয়ে মায়ের আমার এই প্রথম ও শেষ নীল সমুদ্রে ডোঙা ভাসানো! বিলাতে পৌছিয়ে সেখানে (Crystal Palace) স্ফটিক প্রাসাদের সামনে লণ্ডনের উপকণ্ঠে নরউডে আমার জন্ম। প্রায় সমুদ্র গর্ভে জন্ম বলে নাম হ'লো বারীন্দ্রকুমার। আগেই বলেছি দাদার জন্মের পর থেকে মা অল্পে অল্পে পাগল হচ্ছিলেন। মায়ের ডাক্তারের নাম ছিল ম্যাথিউ, আর ক্রাইষ্টের জন্মের পরই ৫ই জানুয়ারী আমার জন্ম

বলে পাগলী মা আমার এক উদ্ভট বাইবেলী নাম রাখলেন— ইম্যানিউয়েল ম্যাথিউ ঘোষ। ক্রয়ডনের বার্থ্ রেজেষ্ট্রী অফিসে লিখলে এখনও ঐ নামে জন্মের সার্টিফিকেট পাওয়া যায়।

দাদা শ্রীযুক্ত বিনয়ভূষণ ঘোষ জন্মেছিলেন ভাগলপুরে, মেজদা' শ্রীমনোমোহন ঘোষেরও জন্ম সেইখানে। শ্রীঅরবিন্দ—আমার সেজদা' জন্মেছিলেন কলকাতায়। দিদি শ্রীসরোজিনী ঘোষের জন্ম রংপুরে এবং আমার জন্ম বিলাতে নরউডে। ছেলেপুলে নিয়ে সস্ত্রীক বাবা বিলাত যান এবং একা ফিরে আসেন ১৮৭৯ সালের আগষ্ট মাসে, মাও আমাকে ও দিদিকে নিয়ে একা দেশে আসেন আমার জন্মের তিন মাস পর ১৮৭০ সালের মার্চ্চ মাসে। দেশে ফিরে এসে কত দিন মা ও বাবা একত্র ছিলেন, কবেই বা আমাকে ও দিদিকে নিয়ে মা রোহিণীতে বাস করতে গেলেন এসব ইতিবৃত্ত জানে এমন মানুষ বোধ হয় এখন আর কেউ বেঁচে নেই। পাগল মায়ের কোলে সুখে ও দুঃখে আমি ও দিদি বাড়তে লাগলুম। তিন দাদা বিলাতে শ্বেতদ্বীপের মায়াপুরীতে মানুষ হ'তে লাগলেন। সেখানে তাঁরা ছিলেন চৌদ্দ বৎসর। রংপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট গ্লেজিয়ার (Glazier) সাহেব ছিলেন বাবার বন্ধু, তাঁরই আত্মীয় non-conformist পাদ্রী ড্রুইড সাহেবের পরিবারে ম্যাঞ্চেষ্টারে তিন ভাই থাকতেন। সেজদার নাম যে হয়েছিল অরবিন্দ অক্রয়েড ঘোষ সেই অক্রয়েড Akroyd পরিবার এই ড্রুইডদের আত্মীয় ও তাঁরাও বাবার পরম বন্ধু ছিলেন।

দুই

বাবার চেহারা এখনও আমার মনে আছে। শ্যামবর্ণ, বড় বড় ভাসা চোখ, মাইকেল মধুসূদনের মত মুখাকৃতি, নাতিদীর্ঘ ঋজু দৃঢ়পেশী শরীর, নতুন গুড়ের মত মিষ্টি স্বভাব, সদাপ্রসন্ন মূর্ত্তি, অথচ একরোখা শক্তিমান পুরুষ। ডাক্তারীতে তাঁর যশ ছিল প্রচুর, ঠাকুর দেবতার কাছে মানতের মত বেশী রোগী তাঁর কাছে এসে জীবন ও পরমায়ু ভিক্ষা করতো। টাকা তিনি উপার্জ্জন করতেন প্রচুর আর ব্যয়ও করতেন অপরিমিত ভাবে। তাঁর দয়া ও মমতার কাহিনী খুলনায় এখনও কিম্বদন্তির মত মানুষের মুখে মুখে রয়েছে। নারীর মত কোমল প্রাণ ও প্রেমপ্রবণ চিত্ত নিয়ে এই শক্তিধর মানুষটি সংসারের সুখের নীড় বাঁধতে এসেই আঘাত পেলেন নিদারুণ—কোথা থেকে ক্রূর বাজের মত উন্মাদ ব্যাধি এসে তাঁর অন্তরের মানুষ জীবনের

সঙ্গিনীটিকে দিলে ক্ষেপিয়ে। প্রেমের একটা অকূল সাগর বুকে করে যে মানুষ মমতাময় প্রাণ নিয়ে জগতে এসেছে, তার একমাত্র ভালবাসার বস্তুকে কেড়ে নিলে সে যদি পথভ্রষ্ট হয় তা' হ'লে তার দোষ দেওয়া চলে কি? সে ক্ষেত্রে অতখানি প্রেমের অতখানি উচ্ছল প্রাণশক্তি উন্মার্গগামী হওয়াই তো স্বাভাবিক। নীতিবাগীশ হচ্ছে পেচক জাতীয় জীব, সত্যের দিক্‌প্রকাশী আলোয়—দিনের বেলা সে কাণা. নীতির আধ আলো আধ-আঁধার রাত্রে তার চোখ ফোটে ভাল; তখন সে জগতের অমঙ্গল কল্যাণ খুঁজে খুঁজে ঘুরে বেড়ায় আর কর্কশ বীভৎ ডাক ডাকে। মানুষের মন প্রাণ হৃদয় ও দেহ যে কি জটিল জিনিস, কি পর্য্যন্ত সূক্ষ্ম ও সুকুমার যন্ত্র তা' নীতিবাগীশ ধরতে পারে না। কোথায় কতটুকু আঘাতে সে যন্ত্র বিকল হয় তা সে বুঝবে কি করে?

মায়ের মত উদ্দাম পাগলের সঙ্গে সারা জীবন ঘর করা খুব ধৈর্য্যের ও সহিষ্ণুতার কথা, বাবা তা' চেষ্টা করেও পারেন নি। তবু সে চেষ্টা কম দিন তিনি করেন নি, মার পাগল হতে আরম্ভ হবার পরও তাঁদের চার ছেলে ও এক মেয়ে হয়েছিল। বোধ হয় আমার জন্মের পর বিলাত থেকে ফিরেই দু'জনে পৃথক হন, মা এসে রোহিণীতে বাস করেন। মাকে বাবা মাসে মাসে আর্থিক সাহায্য করতেন, খুব সম্ভব সে সাহায্যের পরিমাণ ও তাঁর আসা যাওয়া ক্রমশঃ কমে এসেছিল, কারণ রেল লাইনের ধারের সেই সাহেবী বাড়ীর মত খানসামা, বাবুর্চি, আয়া ও আড়ম্বর আর তারিণীবাবুর বাড়ীতে ছিল না। একটা চাকর

বিত‌‌ংজল আর মা করতেন রান্না। শেষের দিকে টাকা আসতো দাদাবাবু রাজনারায়ণ বসুর হাতে, কারণ আমরা দেখতাম বাঁকে করে করে লোকে মাস কাবারের বাজার দাদাবাবুর বাড়ী থেকে নিয়ে মায়ের কাছে দিয়ে যেত।

বাবার স্বভাব ছিল বেহিসেবী খরচে, টাকা তাঁর হাতে ভোজবাজীর সৃষ্ট জিনিসের মত দেখতে না দেখতে উড়ে যেত। দয়ার বশে যে নারীর অধিক অসহায় ও দুর্ব্বল, বন্ধুর জন্তে যে এক কথায় সর্ব্বস্ব দিয়ে দিতে পারে, পরিচিত অপরিচিতের যে মানুষ স্বভাবতঃ পরমাশ্রয়, সে মানুষ অমিতব্যয়ী হলে যা' হয় এক্ষেত্রেও তাই হয়েছিল। ছেলে তিনটিকে বিলাতে শিক্ষার জন্তে রেখে এসে বাবা কিছু দিন নিয়মিত টাকা পাঠালেন, তার পর সেদিকেও বিশৃঙ্খলা এল। এই রকম মানুষ দুনিয়ায় অনেক আছে যারা দুঃস্থের জন্তে দানসত্র খুলে বসে আছে, আর তার নিজের পরমাত্মীয় উপবাসে মরছে।

তিন দাদা প্রথমে পাঁচ বছর ম্যাঞ্চেষ্টারের গ্রামার স্কুলে পড়লেন, তারপর দু' এক বছর ড্রুইডের মায়ের কাছে লণ্ডনে এসে রইলেন। কোন অভিভাবকের অধীনে থাকা এই তাঁদের শেষ। তিন জনে সেন্ট পলস্ স্কুলে পড়ছিলেন, সেখান থেকে ৪০ পাউণ্ড স্কলার্শিপ পেয়ে অরবিন্দ গেলেন (খুব সম্ভবতঃ) কিংস কলেজ কেম্ব্রিজে ও মেজদা' মনোমোহন গেলেন ক্রাইষ্ট চার্চ্চ কলেজ অক্সফোর্ডে। বাবা এ সময়ে টাকা পাঠাতেন

এখন তখন, ডুইডও তাঁর কাছে অনেক টাকা পেত, পরে সে অষ্ট্রেলিয়া যাবার পথে ভারতে এসে বাবার কাছে নিজের প্রাপ্য টাকা নিয়ে গেল।

বিলাতের জীবনে শেষ পাঁচ বছর দাদাদের বড়ই অর্থাভাব গেছে। বছরে ৩৬০ পাউণ্ড পাঠাবার কথা, এক বছর বাবা পাঠালেন মাত্র এক শ' পাউণ্ড। বড়দা'র দর্জি ইত্যাদির দোকানে যে ঋণ হল তা তিনি পরে ভারতে এসে পরিশোধ করেছিলেন। শ্রীঅরবিন্দের মুখে শুনেছি অনেক দিন তিনি একটা কি দু'টো স্যাণ্ড উইচ্ খেয়েই কাটিয়েছেন। সেখানে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের আলোচনা-সভা ছিল, তার নাম ছিল 'মজলিস'। সেই সভায় গরম গরম রাজনৈতিক বক্তৃতা দেওয়ায় শ্রীঅরবিন্দ সেই বয়সেই গভর্ণমেণ্টের সুনজরে পড়েন। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন ছিলেন সেখানে শ্রীঅরবিন্দের সমসাময়িক। I. C. S পরীক্ষায় বেশ সম্মানের সঙ্গে পাশ করেও তুচ্ছ ঘোড়ায় চড়ায় যে তাঁকে অকৃতকার্য্য বিবেচনা করা হ'লো তার কারণ খুবই সম্ভব গভর্ণমেণ্টের ঐ সুনজর, সেই সময়ে এই নিয়ে ভারতে সংবাদ-পত্রে খুব আন্দোলন হয়েছিল।

তিন ভাইএর মধ্যে শ্রীঅরবিন্দই প্রথম দেশে আসেন। ভারতে জনপ্রিয় সার হেনরী কটন ছিলেন দাদাবাবু রাজনারায়ণ বসুর বিশেষ বন্ধু। বড়দা' তাঁর ছেলে জেমস্ কটনের কাছে শ্রীঅরবিন্দকে নিয়ে যান; জেমস্ কটন তাঁকে গায়কবাড়ের সঙ্গে পরিচিত করিয়ে দেওয়ায় গায়কবাড় তাঁকে প্রাইভেট সেক্রেটারী

করে দেশে নিয়ে আসেন। তার পরে দেশে আসেন বড়দা' ১৮৯৩ সালের এপ্রিল মাসে। কুচবেহার মহারাজ-কুমারের শিক্ষক হবার পর আজমিরে গিয়ে ১৫০০ টাকা ঋণ করে বড়দা' যখন বিলাতে টাকা পাঠালেন তখন মেজদা' মনোমোহন দেশে আসতে পারলেন। এইখানে পড়লো তাঁদের বিলাতের শিক্ষা জীবনের যবনিকা।

I. C. S পরীক্ষায় অরবিন্দ অকৃতকার্য্য হবার পর বাবা নিরাশ হ'য়ে পড়েন, তাঁর বড় সাধ ছিল অরবিন্দ I. C. S হয়ে এসে তাঁর মুখোজ্জল করবেন। আজ বাবা বেঁচে থাকলে তাঁর দেশ-বিশ্রুত সন্তানের পৃথিবীব্যাপী যশ কি ভাবে নিতেন জানি নে। সন্তানের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে মা বাপের সাধ আকাঙ্ক্ষার মূল্য এইটুকু. খুব কম পিতা মাতাই সন্তানকে তার নিজের পথে বিকাশ লাভ করতে দেয়, সংস্কার-বদ্ধ স্নেহ-অন্ধ তাদের মন ও প্রকৃতি অবোধ অবুঝ সন্তানকে গরু-তাড়ানো করে তাড়িয়ে নিয়ে চলে নিজের বাসনার সাধ আকাঙ্ক্ষার পথে। মায়ের ও বাপের ভালবাসা স্থূল দৃষ্টিতে দেখতে বেশ নিঃস্বার্থ ও উচ্চস্তরের বলে দেখায় বটে কিন্তু আসলে সে প্রেমও যথেষ্ট স্বার্থদুষ্ট। সাধারণ সংসারী মা বাপ চায় সন্তানকে দিয়ে অর্থ পেতে, সাংসারিক সুখ সুবিধা করে নিতে, যশ মান সম্ভ্রম কুলগৌরব বাড়াতে। কথায় কথায় তাদের ঐ এক অজুহাত, "আমরা যে এত কষ্টে ওকে মানুষ করলাম!" সন্তানের প্রকৃত কল্যাণ—তার প্রকৃতিরই যথার্থ বিকাশ ও উন্মেষ খুব কম মা বাপই বোঝে বা

তার সহায়তা করে। মা বাপের স্নেহ স্বার্থে পঙ্কিল, সংসারের লাভ লোকসান খতানো ভালবাসা, নইলে নিজের নাড়ীছেঁড়া ধনকে মানুষ এত সহজে ত্যাজ্যপুত্র ত্যাজ্যকন্যা করে যত সহজে রাগী বাপ মা সংসারে সচরাচর করে থাকে?

মানুষকে কতখানি শাসন করতে হবে, কতখানি মুক্তি ও কতখানি বন্ধন তার বিকাশের অনুকূল, কোন্‌খানে শাসন মাত্রা ছাড়িয়ে গিয়ে তাড়নায় পরিণত হ'লো, মানুষকে ফোটাবার বদলে চেপে পঙ্গু করতে লাগল তা' এখনও মানুষ ঠিক করে উঠতে পারে নি। এই সেদিন অবধি স্কুল পাঠশালা ছিল শিশুর কাছে ঠিক যেমনি ভয়াবহ প্রহার-তাড়না-কণ্টকিত কারাগার, যেমন ছিল তার কৈশোর ও যৌবনের সমাজ, তার প্রৌঢ়ত্বের রাষ্ট্র।

মা বাপের তাড়না, গুরুমশাইয়ের বেত, বামুন পুরুতের অভিশাপ, সমাজপতির ভ্রুকুটি, দেবতার নরকাগ্নি, রাজার পুলিশ, এবং অবশেষে করাল যমরাজের দূত—ভয়তাড়িত সঙ্কুচিত আড়ষ্ট কি সে জীবন মানুষের বল দেখি? আর তারপরেও—এতখানি পীড়ন শাসন তর্জ্জন গর্জ্জন প্রহার অপমান ও প্রাণবধ করেও কি এমন আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্র আমরা গড়েছি যার জন্যে মানব জাতি গর্ব্বে আজ মাথা উঁচু করে জগতের সামনে দাঁড়াতে পারে! মানুষ তার মানবতার গুটি (Crysalis) কেটে দেবত্বের ব্যাপক আকাশে ওড়বার কয়টি বর্ণ-সুরঞ্জিত চিত্রবিচিত্র ডানা আজ অবধি গজাতে পেরেছে?

যাক্ সে কথা। কোন গতিকে দাদাদের পূর্ব্বজীবন সংক্ষেপে

সেরে নিয়ে আবার আরম্ভ করি আমার শৈশব-কথা। লালা তারিণীচরণের বাড়ীতে আমার প্রায় আট বছর বয়স হবার পর আমাদের পালে বাঘ পড়লো। কোথা থেকে কি হল জানি নে; একদিন কারা যেন এসে দিদিকে নিয়ে চলে গেল আমাকে এই পাগল মাতৃস্নেহের কারাগারে একলা ফেলে। দিদিমাদের বাড়ী গিয়ে শুনলাম বাবা তার মেয়েকে নিজের কাছে রাখবার জন্যে চেয়ে পাঠিয়েছেন, পাগল মা ৪০০৲ টাকা নিয়ে দিদিকে ছেড়ে দিয়েছে। আগেই বলেছি দিদিকে মা দেখতে পারতেন না, একগুঁয়ে শক্ত মেয়ে দিদি সে বয়সে খুব কম লোকেরই মন বা হৃদয় আকর্ষণ করতে পারতেন। দিদির মত এসব শক্তির আধার দৃঢ় প্রকৃতি নমনীয় ও কোমলকেই শুধু স্নেহে ভালবাসায় আঁকড়ে ধরতে পারে, নিজের মত সমান শক্তিমানের সঙ্গে লেগে যায় তাদের সংঘর্ষ, ঠোকাঠুকি। এ জগতে আশ্রয়দাতাও এসেছে আর আশ্রিতের দলও এসেছে; প্রেমের জগতে একদল ক্ষত্রিয় ও অপর দল শূদ্র। একদলেরা ভালবেসে করে প্রভুত্ব, দেয় কোল, আর একদল আনন্দ পায় পূজা করে, আপনাকে বিলিয়ে দিয়ে—সেবায় প্রেমার্চ্চনায়। এ ছাড়া আবার এই দুই প্রকৃতির অসম মিশ্রণে এমন সব কিভূত কিমাকার মানুষ এসেছে যারা না নেতা আর না নীত। শক্তি নেই অথচ প্রভুত্বের অহঙ্কার ও দুশ্চেষ্টা আছে, সেবার ও আত্মোৎসর্গের সামর্থ্য নেই অথচ নিজকে দেবার তীব্র আকুলি ব্যাকুলি আছে—এই চিত্রই সংসারে বেশী দেখতে পাওয়া যায়।

দিদিকে যে কে কোথায় নিয়ে গেল যাদুমন্ত্রে উড়িয়ে তা' ভাল করে বুঝলাম না, শুধু একলা পড়ে রইলাম সেই নির্ব্বান্ধব পুরীতে দুর্দ্দান্ত মাকে আশ্রয় করে। ছোট ছেলে মেয়ের জীবনের মত নিরুপায় অসামর্থ্যের এমন করুণচিত্র আর আছে কি? ভাগ্যক্রমে প্রকৃতি মানুষের হৃদয়ে বাৎসল্য প্রেমের এত খানি বেগ দিয়েছিল, নইলে জগতের এত কোটি কোটি শিশুর ভাগ্যে কি শোচনীয় পরিণাম যে ঘটতো।

এর দু' বছর পরে আবার পালে বাঘ দেখা দিল আমায় ছোঁ মেরে নেবার জন্যে। তখন আমার দশ বছর বয়স, জীর্ণ শীর্ণ চেহারা, অক্ষর পরিচয় অবধি হয় নি। বাহিরের জগতের সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ আমাকে হঠাৎ মুখে করে কোন্ এক গড়ুর পক্ষী তুলে এনে ফেলে দিল আলাদিনের যাদুর মায়াপুরীতে। শুনেছি রিপ ভ্যান্ উইঙ্কল নাকি একটানা বিশ বছর ঘুমিয়েছিল, সেই কাল ঘুম থেকে জেগে সে দেখে তার চোখের সামনে এক অদ্ভুত অচেনা জগৎ। সব বদলে গেছে, তার জাগ্রত কালের সে সব মানুষ, সে রাজা প্রজা, সে নগর পল্লী কিছুই আর স্বস্থানে স্বমূর্ত্তিতে নেই। রিপ্ ভ্যান উইঙ্কলের বিস্ময় আমার সেই হঠাৎ-দেখা অচিন্ত্যপূর্ব্ব অদৃষ্টপূর্ব্ব জগতের দর্শন জনিত বিস্ময়ের চেয়ে অনেক কম। কোথায় বন-গাঁ রোহিণী, তার বুকে মায়ের কড়া শাসনের পাগলা গারদ, তারিণী বাবুর বাড়ীর কম্পাউণ্ড আর কোথায় আলো মানুষ যান বাহন রাস্তা ঘাট প্রাসাদ

হর্ষের মহা অরণ্য কলকেতা! কিন্তু তার আগে বলি আমাকে রুক্মিণী-হরণ করে নিয়ে যাবার কথাটা।

কিন্তু আমায় রুক্মিণী-হরণ করে নিয়ে যাবার কথা বলবার আগে শৈশবের আরও যে অনেক কিছু এখনও বলা হয় নি। বাল্যকালের সেই পাগলী মায়ের কড়া শাসনে রোহিণীর জীবন সে এক অপূর্ব্ব অভূতপূর্ব্ব কাণ্ড। আমার জীবনে যা কিছু ঘটেছে তা' প্রায়ই এমনই অভিনব, যে, আর কারু কখনও সে রকমটি হয়নি। রোহিণীর বাড়ীখানি বাংলো প্যাটার্ণের, পূব ও পশ্চিম বারাণ্ডা, দুইখানি বড় পাশাপাশি হল ঘর, পূবের বারাণ্ডার খানিকটা ঘুরে দক্ষিণেও গেছে। উত্তরে একখানা পূব পশ্চিমে লম্বা ফালি ঘর, তিন ভাগে ভাগ করা, তার পূর্ব্ব ও উত্তর কোণে বাথ রুম ও ল্যাভেটরী। দক্ষিণের বারাণ্ডাটুকুর কোণেও একটা বাথ রুম ও আর একটা ছোট ঘর। বাড়ীখানি প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের মধ্যে, তার পূব দিকে কলমের আমের বাগান, উত্তরে সবজীবাগান ও কূয়া, দক্ষিণে ফুল বাগান, পশ্চিমে নানান গাছের সঙ্গে একটি পিচ গাছ। মায়ের কড়া পাহারায় আমরা বাড়ী থেকে পাঁচ দশ হাতের পরিধির বাইরে যেতে পারতাম না। মা আমাদের বাইরে পূবের বারাণ্ডায় বার করে দিয়ে ঘরে দুয়ার দিয়ে আপন মনে বিড় বিড় করতেন আর আমরা দুই ভাই বোনে ভয়ে আশঙ্কায় ও বাল্যের সহজ স্বতঃস্ফূর্ত্ত আনন্দে খেলা করতাম। মা মাঝে মাঝে ভিতর থেকে হাঁকতেন "এই সরি" "এই বেরে" "আছিস্ তো?" আমরা

"হাঁ মা" বলে সাড়া দিয়ে কিছুক্ষণ উৎকর্ণ আড়ষ্ট হয়ে থাকতাম। মা বেরুলেন না দেখে আবার চাপা গলায় আমাদের আবোল তাবোল কলরব আরম্ভ করতাম।

সেই সময়ে চারিদিকের জগৎটা কত যে লোভনীয় জিনিসে ভরপূর ছিল তার ইয়ত্তা নেই। এখনও মনে পড়ে উত্তরের সবজী বাগানে একটা শিউলী ফুলের গাছ ভোরের শিশিরে ভিজে কুশমী রঙের বোঁটাওয়ালা সাদা সাদা ফুলের রাশি বিছিয়ে আমাদের কাছে তার সৌরভের প্রাণ পাগল করা আমন্ত্রণ লিপি পাঠাতো আর আমরা সেখানে যাবার জন্যে ছটফট করে মরতুম। পূব কোণে একটা পাতায় পাতায় কালো বিরাট জাম গাছ ছিল, তার থলো থলো গাছভরা কালো জাম আমাদের শিশু মনকে একেবারে পাগল করে তুলতো আর ঐ পূব-দক্ষিণ কোণের খেজুর গাছের গলায় রাঙা ফলের থলোর টান, পশ্চিমের পিচ গাছের পিচ ফলের লোভ, কলমের আম গাছে লম্বা লম্বা বড় বড় আমগুলি—উঃ! সে স্মৃতি কি ভোলবার? মালী মাঝে মাঝে ফলের উপঢৌকন নিয়ে মেম সাহেবকে তুষ্ট করতে এবং কিছু বকৃসিস আদায় করতে আসতো, সে দিন আমাদের পড়ে যেত এক মহোচ্ছবের পালা।

বাইরের জগতের কিছুই আমি জানতাম না দশ বছর অবধি। অথচ বাইরের জগৎ তার রহস্যে নিবিড় আঙুল বাড়িয়ে দিয়ে অহরহই ডাকতো এই সহজে কুতূহলী শিশু হৃদয় দু'টিকে। আমারই মা না হয় পাগল ছিলেন, কিন্তু এই সংসারের কত

ঘরের কত মা কতই যে স্নেহের অত্যাচারে আগলে ঘিরে কত শত বুভুক্ষু শিশু হৃদয়কে প্রকৃতির কোল থেকে মাঠে মাঠে ধানের আলে ছুটাছুটি ও বন ভোজনের আনন্দ থেকে বঞ্চিত করে রাখে! সে ব্যাকুল মন প্রাণগুলির তাতে কোন উপকারই হয় না, কারণ অবাধ প্রকৃতির কোলের মত একাধারে এত বড় স্কুল ও ক্রীড়াক্ষেত্র শিশু মনের জন্যে আর কি আছে? সেখানে প্রকৃতি-রাণী তার উদ্ভিদ জগতের মাটির জগতের ও জলের বুকে কত না পাতা মুড়ে খুলে আধ মোড়া করে রেখে দিয়েছে; সেখানে আকাশ সিন্ধু বিস্তৃত হয়ে রয়েছে তাদের নীল গভীরতা নি'য়। মাঠে, বনে, পাথরের ফাটলে, পাতার ঢাকনীর আড়ালে তাদের টল্‌টলে কালো রাঙা প্রবালের ছাই রঙের কত না রকম চোখ নিয়ে ঘুরছে সতর্ক টিকটিকী, বহুরূপী নৃত্যশীল খঞ্জন, বুলবলী, ভীরু কাঠবেড়ালী, শশক, চঞ্চল ফিঙে, তির্য্যকগতি ডোরাকাটা বর্ণবিচিত্র ভুজঙ্গ, কদাকার গঙ্গাফড়িং, অলস শামুক, গুগলী, কুব্জপৃষ্ঠ কচ্ছপ, কত না অনুপম অভিনব জীব পরিবার! এই বিরাট অযত্ন-বিস্তীর্ণ সহজলভ্য জ্ঞান-ভাণ্ডারের দুয়ার রুদ্ধ করে বৃথা জ্ঞান-গর্ব্বে স্ফীত মূর্খ বাপ মা স্বভাবতঃ কুতূহলী শিশু মনগুলিকে আড়ষ্ট করে রাখে নিরস কঠোর খেলনায় ও বইয়ের পাতায় বেঁধে। তারা বোঝে মাতৃবৎসল পিতৃবৎসল সন্তান, বাপ মায়ের দাস, শৈশব থেকে উচিৎ অনুচিতের জুজুর ভয়ে জবুথবু ভয়ার্ত্ত শিরদাঁড়া-ভাঙা ভালছেলে।

পাগল হয়েও আমাদের মা এড়াতে পারেন নি, অধিকন্তু তাঁর পাগলামীর খেয়ালে ও রাগে আমাদের চোখে মা আমাদের হয়ে ছিলেন ভয়ানাম্ ভয়ং ভীষণং ভীষণানাম্। একদিকে মায়ের নির্মম মারের ভয় আর একদিকে খোলা মাঠের বাগানের ঝোপঝাড়ের ঝুপসীর কাশবনে ঢাকা স'দা খেজুর তলার টান। শেষে প্রকৃতিরই হতো জয়। আমি চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে মাকে শুনিয়ে এক কল্পিত দিদির সঙ্গে করতাম গল্পগুজব আর দিদি রুদ্ধশ্বাসে একছুটে চলে যেত খেজুর তলায় বা কলমের আম বাগানে বা পিচগাছের নীচে পাকা পাকা পিচফলের সন্ধানে। আবার দিদি এসে দিত গল্প জুড়ে এক কল্পিত সাজানো আমার সঙ্গে আর আমি দিতাম ভোঁ দৌড়।

মাঝে মাঝে মা আমাদের পাল্কী করে নিয়ে যেতেন দেওঘরে দিদিমার বাড়ী। সেখানে বেহারাদের এহুম্ ওহুম্ রবে আকাশ পথ মুখরিত করে আমরা গিয়ে নামতুম একঝাঁক মামা মাসী মাসতুতো ভাই ও বোনের পালে, কত পিঠে চন্দ্রপুলী সন্দেশ ও লুচির রাজ্যে। রাজনারায়ণ বসুর পুরন্দাহার বাড়ী তৈরী হবার আগে দিদিমারা থাকতেন থানার সামনে রেল লাইনের ধারে একটা বাড়ীতে। তার অন্দরের দরজায় বাইরের দিকে ছিল একটা বাঁধানো রকের মত বসবার পৈঁটে, তারই ওপর ছেলে মেয়ে নাতী নাতনী নিয়ে ভিড় করে দিদিমা এসে আমাদের পাল্কী থেকে নামিয়ে নিতেন। আমাদের কাপড় ছিল পাগলী মায়ের নিজের হাতের কাটছাটের সেলাই

করা সে এক অদ্ভুত নিকার বকার ও ক্রক। আমরা ছিলাম অযত্নে পীড়নে অর্দ্ধাহারে লালিত জীর্ণ শীর্ণ কৃশকায় ভীরু 'দুটি' ছেলে মেয়ে। দিদিমার হাতে গড়া একখানা পূরো চন্দ্রপুলী পাওয়া আর প্রহার থেকে অব্যাহতি এই মহোচ্ছবের ছিল সব চেয়ে বড় অঙ্গ।

রোহিণীর বাড়ীর প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের ধার দিয়ে বাইরের পথ বেয়ে চলে যেত বছরে একদিন দশমীর ভাসানের মিছিল। তারিণী বাবুদের ক'ভাইএর বাড়ী থেকে ও রোহিণীর ঠাকুরদের (জমিদার) রাজবাড়ী থেকে বেরুত সারে সারে প্রতিমা— রাঙতার ও সোণারূপার সাজে ঝলমল করতে করতে মশাল আতসবাজী ধ্বজ পতাকা ও জরির সাজপরা হাতি ও ঘোড়া সমেত। আমরা কম্পাউণ্ডের Cactus বেড়ার ধার ঘেঁসে দাঁড়িয়ে বিস্ফারিত নেত্রে দেখতাম এই অপূর্ব্ব সমারোহ ও জনকোলাহল। পৃথিবীর কোথায় এত মানুষ থাকে, হঠাৎ কোথা হ'তে এসে জড়ো হয়; শিশু মন তার কোন মীমাংসাই, কোন কূলকিনারাই করে উঠতে পারতো না। ঠাকুর ভাসান হয়ে গেলে আসতো বাঁকে করে লালাবাবুদের ওখান থেকে ও রোহিণীর ঠাকুরবাড়ী থেকে ভারে ভারে মেঠাই জিলেবী, প্যাড়া, বালুসাই, খাজা, হালুয়া, পুরী ইত্যাদি লোভনীয় মিষ্টান্নের রাশি। এক একটা কমলা লেবুর মত বড় বড় মেঠাই দেখে আনন্দের আতিশয্যে আমাদের নিশ্বাস ফেলা দায় হতো।

এই শৈশবের পাগলা গারদের জীবনে সব চেয়ে ভয়াবহ

সময় ছিল যখন মা ক্ষেপতেন। পাগলের আসতো রাগের ঝড় আর আনন্দের ঝড় পালাপালি করে, আনন্দে আপন মনে খল খল করে হাসতেন আর অনর্গল বকে যেতেন, রাগে পিঞ্জরায় বদ্ধ বাঘিনীর মত ঘরে করতেন পায়চারী আর যেন কাদের উদ্দেশে তর্জ্জন গর্জ্জন। বাবা ও দাদাবাবুকে লক্ষ্য করে বলতেন, "শ্বশুর জামাইকে এক ফাঁসী কাঠে লটকাও।" রাগের মাত্রা বাড়লে আমাকে ও দিদিকে মারতেন নির্দ্দয় হয়ে, কিল ঘুসি, খিমচি, কাণমলা, চুলটানা, চ্যালা কাঠের বাড়ি যখন যা' খুসী। দিদিকে মারতেন সব চেয়ে বেশী, কারণ ওরই মধ্যে কোলের ছেলে আমাকে একটু ভালবাসতেন দিদির চেয়ে বেশী। এখনও নির্দ্দয় দৃশ্য আমার মনে গাঁথা আছে, দিদি উপুড় হয়ে পড়ে আছেন আর মা তাঁর পিঠের উপর বসে গুম্ গুম্ করে কিলোচ্ছেন আপ্রাণ বেগে।

আমার মা ছিলেন পাগল, পাগলামীর ঝোঁকে করতেন মার-ধর; কিন্তু অনেক মা বাপকে রাগের বশে দেখেছি ছোট ছোট কচি ছেলে মেয়েকে প্রায় এমনি নির্দ্দয় হয়েই ঠেঙাতে। রাগ কাম ও দর্পের বশে আমরা কত বারই যে পাগল হচ্ছি Temporary insanityর ছোঁয়াচ লেগে। কখন কখনও মার সহ্য করতে না পেরে দিদি ছুট দিতেন বাড়ীর কম্পাউণ্ড পেরিয়ে মাঠের পথে দিদিমাদের বাড়ীর দিকে। একটা পাগল বামুন মাঝে মাঝে আসতো ভিক্ষা করতে, তাকে মা দিতেন দিদিকে ধরে আনতে লেলিয়ে। দাড়োয়া নদীর বাঁক থেকে, মাঠের

মধ্যে থেকে—এমনিতর আধ পথের কত না জায়গা থেকে পাগলটা আনতো দিদির চুলের মুঠি ধরে। তার পর চলতো আরও দুর্জ্জয় প্রহার। ছেলে পুলে পশুর জাত, তেমনি লোভী ও স্বার্থপর, তেমনি হিংসুটে ও সরল,—মায়ের মন পাবার জন্যে আমি কত রকমে লাগিয়ে ভাঙিয়ে দিদিকে আরও বেশি বেশি করে মার খাওয়াতাম যাতে আমার ভাগের মারটা কিছু কম পড়ে।

অসহ্য ভয়ের ও দুঃখের শোণিত-রেখায় আঁকা শৈশবের এই রোহিণীর জীবন,—কালো জমাট দুঃখের মেঘের ফাঁকে ফাঁকে জরির পাড়ের মত বাল্যের স্বাভাবিক অনাবিল আনন্দের রশ্মি। এ রকম জীবনে মায়ের স্নেহ-কোল—সে অনুপম প্রেমবিধুর মাতৃছবি বুঝবার অবসর কোথায়? আসলে আমাদের মা থেকেও ছিল না। গল্পের রাক্ষসী বা জটে বুড়ীকে শিশু-মন যেমন ভয় করতে শেখে আমার কাছে মা ছিল তেমনি আতঙ্কের বস্তু। তবু ওরই মাঝে পাগলী মা যে কতখানি ভাল আমায় বাসতেন তা' পরের জীবনে বুঝেছি। বাবা তখন খুলনার সিভিল সার্জ্জন। দুঃস্থের ও দরিদ্র রোগীর সেবা, দু'হাতে দান খয়রাত আর মদ তাঁর ছিল নিত্য সঙ্গী; অর্থোপার্জ্জন করতেন বিস্তর এবং তা' দু'হাতে ওড়াতেন পরের জন্য। প্রার্থী কখনও কিছু চেয়ে তাঁর কাছ থেকে নিরাশ হয়ে ফেরে নি, অত বড় হাট কোট পরা মস্তপ ডাক্তার সাহেব রাত বারোটায় এক হাঁটু জল কাদা ভেঙে গরীব চাষী রোগীকে দেখতে গেছেন বিনা

পয়সায়। এত চরিত্রদোষ থাকতেও এই চিনির মত মিষ্টি মানুষটির শত্রু বলে ভূভারতে কেউ ছিল না। নিজের দুঃখের জীবন নিয়ে তিনি ছিনিমিনি খেলতেন বটে কিন্তু পরের জীবনের জন্য তাঁর ছিল মায়ের অধিক দরদ ও সমবেদনা। দোষে গুণে সুন্দর ও নিতান্তই human চরিত্রগুলির মাধুর্য্য দেখতে না পেয়ে মানুষ করে মরালিটির ভড়ং—একেই বলে prudery !

সেই বাবা উদাসীন হয়ে আমাদের পাগল মায়ের কাছে ফেলে রেখে ছিলেন। রোহিণীর বাড়ীতে শুধু একবার মাত্র বাবা এসেছিলেন বলে আমার মনে আছে। একদিন আমি ও দিদি বাইরে খেলা করছি, কে একজন হোমরা চোমরা গোছের মানুষ এলো। ভিতরে যখন আমাদের ডাক পড়লো তখন আমার এইটুকু মনে আছে, যে, লম্বা দাড়ীওয়ালা ভীষণদর্শন কার হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে আমি আর দিদি সারা ঘরটার দেয়ালের ধারে ধারে ছুটোছুটি করছি আর সেই মানুষটি দুই হাত বাড়িয়ে আমাদের বুকে নেবার জন্যে পাগলের মত আসছে। তারপর অজস্র খেলনা বিস্কুটের রমণীয় স্তূপের মাঝে কখন যেন আমাদের আত্মসমর্পণের পালা সুখের সিন্ধুর দোল খেয়ে সাঙ্গ হয়ে গেল, সে কথা আর স্পষ্ট মনে নেই। বাবার কোলে চড়ে বসেছিলুম আর তাঁর লম্বা দাড়ী আমার গায়ে পড়ছিল এই রকম একটা ক্ষীণ স্মৃতি—অনেক কিছু আধভোলা সামগ্রীর স্তূপে এখনও খুঁজে পাওয়া যায়। আহা! সে বাবা এখন তার ভ্রান্ত উচ্ছৃঙ্খল ছেলেকে ভুলে কোথায় যে গেল !

মাঝে মাঝে মেওয়াবেচা কাবলীওয়ালার আবির্ভাব হ'তো আর আমরা কিসমিস বাদাম আক্রোট খোবানী আনার পেস্তা খেতে পেতাম,এও সেই দুঃখের শৈশবকে সুখস্মৃতিতে কম উজ্জ্বল করে রাখে নি। কাবলীওয়ালারা বোধ হয় ছেলে পুলে ভালবাসে, সুদূর পাহাড়ের তুষার ঢাকা কোলে নিজেদের ছেলেপুলে ফেলে এসে ওদের ক্ষুধিত প্রাণ শিশুর হরিণ চোখের ফাঁদে সহজেই ধরা পড়ে যায়, নইলে মায়ের কাছে মেওয়া বেচে বাইরে এসে আমাদের মুঠি মুঠি মেওয়া বিনা পয়সায় দিয়ে যাওয়ার অর্থ কি? আমার দাদার মেয়ে বুলারাণীর কাছেও শুনেছি ছেলেবেলায় অচেনা কাবলীওয়ালা রাস্তায় তার হাতে দশটাকার নোট গুঁজে দিয়ে চলে গেছে। ওদের মধ্যে কিন্তু বন্য পশুর ভাবও খুবই প্রবল। অশুদ্ধ শক্তিমান রাক্ষস আধারে যা হয় আর কি। ও জাতি কখনও সভ্য ছিল কিনা জানি নে, প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগে গ্রীস রোমেরও আগে হয়তো আর্য্য সভ্যতা ও শিক্ষাদীক্ষা ওখানে ছিল। তারপর এতদিন অসংস্কৃত অশিক্ষিত অবস্থায় থেকে একটা কালচারে অনুশীলন (Background) হারিয়ে জাতটা বুনো মেরে গেছে। আন্দামানে আমাদের ৮০।৯০ জন রাজনীতিক বন্দীকে কঠোর শাসনে রাখবার জন্যে একমাত্র পাঠানই নিয়োগ করা হতো,—পেশোয়ারী ও কাবুলী পাঠান। কারণ ওরা নিষ্ঠুর ও ক্রূর প্রকৃতির, পয়সার লোভে না পারে এমন কুকর্ম নেই। কামের দিক দিয়ে ওরা সচরাচর কামরাক্ষস বিশেষ, স্ত্রীর চেয়ে সুকুমার বালক ওরা কামচর্চ্চার জন্যে ভাল

মনে করে। এ ব্যাধি পারস্যে, তুরস্কে—সব মুসলমানপ্রধান স্থানে একসময় ছিল, বর্মায় আজও খুব প্রবল। অল্প বিস্তর এ কৃত্রিম কামব্যাধি সর্ব্বজাতির মধ্যে থাকলেও রাজসিক বন্য অসভ্য জাতির মধ্যেই বেশি। আরবে তুরস্কে পারস্যে আফ-গানিস্থানে এতদিন নতুন যুগের হাওয়া বয় নি, ওরা এতদিন ধরে চলছিল কোন্ এক অনৈতিহাসিক যুগকে আঁকড়ে। এ সব হচ্ছে জাতির আবদ্ধ জীবন-নদীর গতিহীনতার শৈবালদাম, তারই পঙ্ক,তারই আবর্জ্জনা।

———


SARASWAT LIBRARY
Estd:-1919.
MAKARDAH-HOWRAH.

চার

আমার সারা শৈশবটা জুড়ে চার পাশের ধূসর নীল পাহাড়, সবুজ ধান ক্ষেত, রাঙা মাটির উধাও দিকচক্রবাল-ছোঁয়া মাঠ, গাঢ় ঘন সবুজ বন ও পাখীর কাকলির কি যে সে প্রাণকাড়া ডাক শুনতে পেতুম! প্রকৃতির কোলের শিশুকে ঘিরে প্রকৃতি-রাণীর মাটির বুকের টান কি আকুল প্রেমে লক্ষ অদৃশ্য বাহু মেলে যে কেঁদেছে তা' বলে বোঝান শক্ত! মানুষের শত শত শতাব্দীর আগেকার সে বন্ধন, আর এই সভ্যতা ও শিক্ষার কৃত্রিম সম্বন্ধ এতো এই সে দিনের। সত্যাই, মানুষকে মানুষ করবার জন্যে প্রকৃতির কোলের মত অমন বিদ্যালয়, অমন গুরুগৃহ, অমন মাতৃকোল আর নেই। সহরের ইটের পাঁজায় এই আবদ্ধ জীবন—কলহ অশান্তিতে, হাটের হট্টগোলে উদ্ভ্রান্ত জীবন কেন যে মানুষ স্বেচ্ছায় মাথায় তুলে নেয় তা জানি নে।

এরও মাঝে অবশ্য একটা মগুপের উত্তেজনাময় আনন্দ আছে, দশজনের সঙ্গে থাকার (herd-consciousnessএর) মায়া আছে, কৃত্রিম বিলাস-বিপণীর ও নৃত্যশালার টান আছে, ভোগের ঘূর্ণ্যা-বর্ত্তে আপনাকে ক্ষয় করে ফেলার—উড়ে চলার মোহ আছে। কিন্তু অবুঝ শিশুর কি তাই? সে তো কৃত্রিমতার স্বাদ এখনও পায় নি, তার স্মৃতির পাতায় জন্মজন্মান্তরের প্রকৃতি মায়ের রূপই যে সবার আগে বেশি করে জাগে। এতখানি বয়স হয়ে এখন তো বেশ বুঝতে পারি প্রকৃতির ঐ বিচ্ছিন্ন কোলে আবার ফিরে গিয়ে আমি কতখানি মানুষ হয়েছি আর কতটুকুই বা শিখেছি তোমাদের এই কৃত্রিম শিক্ষার তাড়নায়।

আগেই বলেছি দশ বছর বয়স পর্য্যন্ত আমার অক্ষর পরিচয় অবধি হয় নি! পাগল মায়ের কাছে আমার সে ছিল এক বন্য জীবন। বইএর মুখ সেখানে কখন দেখতে পেতুম না। শুধু যে বর্ণ-জ্ঞানই হয় নি তা নয়, বাইরের জগতের সম্বন্ধে আমার মত অত বড় আনাড়ী এক গভীর লোকালয়হীন বনে ছাড়া আর কোথায়ও সম্ভব নয়। সহর কি, গ্রাম কি, নদী নালা পর্ব্বত আকাশ কোন্‌টা কি তার জ্ঞান ছিল একেবারে অস্পষ্ট, চোখে দেখা অধিকাংশ বস্তুর আসল নামই আমরা জানতুম না, খেয়াল মত নিজে যা হোক একটা নাম দিতুম। ছেলে মেয়েকে লেখা পড়া শেখাতে হ'লে যে অতি শৈশবে বই নিয়ে মাষ্টারের শাসনের তলায় বসাতে হবে এ ধারণা যে কতখানি ভুল তার এক জলন্ত দৃষ্টান্ত আমি স্বয়ং। মায়ের কাছ থেকে ফিরে এসেও স্কুল

কলেজে যে কত সামান্য শিক্ষাই পেয়েছি তা' শুনলে নিয়মিত শিক্ষার পক্ষপাতী মানুষরা অবাক হয়ে যাবেন।

এক দিন সকাল বেলা রোহিণীর বাড়ীর পূবের বারাণ্ডায় আমি একা খেলা করছি, একজন মোটা কসমের ওভারকোটপরা ভদ্রলোক এলেন। আমি ত অবাক্। আমাদের বাড়ীতে জন মানুষ কখনও আসতো না, সে অঞ্চলে প্রসিদ্ধ পাগলী মেম সাহেবের ভয়ে ও-বাড়ীর ত্রিসীমানায় কাউকে ঢুকবার সাহস রাখতে দেখি নি। মা মাঝে মাঝে রেগে উগ্রচণ্ডা হয়ে থাকতেন; তখন বাড়ীর হাতার মধ্যে অপরিচিত মানুষ দেখলে চীৎকার করে গালাগাল দিতেন, ছোরা দেখাতেন, দরকার হ'লে তাড়াও করতেন। তারা তখন প্রাণ ভয়ে পালাতে পথ পেতো না। তারিণী বাবুর একজন মালী ছিল, সে থাকতো ভয়ে তটস্থ হয়ে, মাঝে মাঝে তরকারী ও ফলের ভেট দিয়ে আমার মাকে তুষ্ট রাখতো; বকসিস্‌টা আসটাও মায়ের প্রসন্ন অবস্থায় আদায় করতো কম নয়। বাবুটি এসে মাকে ডেকে কি আলাপ পরিচয় করলেন। আমাকে ফল মেঠাই কি সব দিলেন আর যাবার সময় চুপি চুপি অনেক তথ্য তালাস নিলেন, তারপর চুপি চুপি চাপা গলায় বললেন, "তুমি কোথায় শোও?"

আমি। এ-ঘরে।

বাবু। আর মা?

আমি। ঐ ও ঘরে।

বাবু। রাত্রে এই দরজাটা ভেতর থেকে খুলে রেখো,

তা'লে তোমার রাঙা মায়ের কাছে নিয়ে যাব। কেমন, যাবে?

আমি। যাব, কিন্তু আমায় যে মা খাটের সঙ্গে হাত পা বেঁধে রাখে। দরজা খুলবো কি করে?

বাবুটি অবাক হয়ে খানিক কি ভাবলেন, তার পর বললেন, "আচ্ছা, তুমি যাবে তো? তা' হ'লেই হলো, আমি ব্যবস্থা করছি।" তিনি সে দিন চলে গেলেন। পরে শুনেছিলুম আমাকে বাবার কাছে নিয়ে যাবার জন্য মাকে বলেছিলেন, অনেক টাকার লোভ দেখিয়েছিলেন; মা কিন্তু রাজী হন নি তাঁর কোলের ছেলেটিকে অমন করে ছেড়ে দিতে। আমার বেশ মনে আছে তখন শীতকাল, বোধ হয় অগ্রহায়ণ কি পৌষ মাস। পরের দিন সকালে পূর্ব্বাচলে সবে সোণার থালার মত সূর্য্য উঠছে। মা বেরিয়ে বারাণ্ডায় রোদে দাঁড়িয়ে বিড় বিড় করে আপন মনে কি সব বকছেন আর আমি তাঁর কাছ থেকে একটু দূরে বসে রোদ পোহাচ্ছি।

বারাণ্ডাটার যে মুখটা পশ্চিমের দিকে ঘুরে গেছে সেইখানে কার যেন পায়ের খস্ খস্ শব্দ পাচ্ছি আর কোঁকড়টি হয়ে বসে বসে রোদ পোহাচ্ছি। হঠাৎ একটা গুণ্ডা কসমের গাঁট্টা গোঁট্টা মানুষ এসে মাকে বললো, "মেম সাহেব, ফুল লেগা?" সে এক-কোঁচড় ফুল মায়ের সামনে ঝপ করে ছুঁড়ে দিয়ে আমার দু'হাত চেপে ধরলো, তার পর আমাকে টানতে টানতে নিয়ে দে দৌড়! পিছনে পিছনে রৈ রৈ রবে হল্লা করতে করতে ছুটলো আরও

দশ বার জন জোয়ান। মা তো রেগে কাঁই, দৌড়ে ভিতরে গিয়ে ছোরা এনে উর্দ্ধশ্বাসে গুণ্ডার পালকে তাড়া! আর মাটিতে হ্যাঁচড়াতে হ্যাঁচড়াতে টানতে টানতে আমাকে নিয়ে গুণ্ডার পালের প্রাণ হাতে করে ছুট। পা' ছু'খানা আমার মাটিতে কাঁটা বনে কত জায়গায় ছড়ে গেল। আমাকে যে কোলে তুলে নেয় তাদের তার অবসরটুকু এবং একটুখানি থামবার সাহস অবধি ছিল না, ও-অঞ্চলে মায়ের এমনি ছিল দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ।

রোহিণীর বাড়ীর কম্পাউণ্ডটা প্রকাণ্ড ব্যাপার, প্রায় ১৫।২০ বিঘের ওপর জমিতে বাড়ীখানা। এতখানি পথ পার হয়ে যেখানে আম বাগানে আমাকে ওরা ছেড়ে দিয়ে হাঁপ ছাড়লো, সেখানে দেখলুম সেই মোটা বাবুটি দাঁড়িয়ে, সামনে একটা আট-বেহারার পাল্কি হাজির রয়েছে। বাবুটি আমাকে তাড়াতাড়ি পাল্কির মধ্যে দিলেন পুরে, পাল্কি লোক লস্কর ঘেরাও হয়ে চললো উড়ে সোজা উত্তর মুখো; বাবুটি হাঁপাতে হাঁপাতে পাশে পাশে ছুটলেন, আমাকে ভয়ে আড়ষ্ট দেখে বললেন, "ভয় কি, তোমার রাঙ্গা মায়ের কাছে যাচ্ছ। সে মস্ত সহর, কলকেতা, কত ঘোড়া গাড়ী।" আমি তখন শুধু সভয়ে রোহিণীর বাড়ীর দিকে চাইছিলুম, মায়ের চীৎকার শুনছিলুম আর বার বার জিজ্ঞেস করছিলুম, "মা কি আসছে নাকি, আমাদের ধরে ফেলবে নাকি?"

বাবু। উহু! সেটি আর পারছে না। আমরা এখনি গিয়ে গাড়ীতে উঠে হুস্ হুস্ করে দেব পাড়ি কলকেতামুখো।

এই ভাবে রাবণ রাঙ্গার দ্বারা বনবাসিনী সীতাহরণের মত আমার হরণ দিয়ে হ'লো আমার নতুন জীবনের সূত্রপাত। সেই প্রথম রেলে চড়লুম—জসিডি জংশনে এসে। প্রথম দফায় বাবুটি একঠোঙা জল খাবার দিলেন হাতে। সে কি বিপুল মুক্তির আনন্দ! সে কি আনন্দ সমারোহের নবীন জগৎ আমার চারিদিকে! বোধ হয় বেলা দশটা বা এগারটার একটা গাড়ীতে আমরা চড়ি আর সেই দিন সন্ধ্যার পর রাত্রের অন্ধকারে কলকেতায় পৌছাই। সমস্ত রাস্তা এই অজ্ঞাত অপরিচিত রাঙ্গা মার সম্বন্ধে নানা প্রশ্নে বাবুটিকে উস্তোম ফুস্তোম করে মেরেছি। আমার সমস্ত শিশুচিত্ত ও কল্পনা জুড়ে তখন রূপ নিচ্ছে ঠাকুরমার গল্পের রাজরাণীর মত এই রাঙ্গা মা। বালকের মত সহজ আর কি আছে, তাই তার কাছে ভাল মন্দের হিসাব বুদ্ধি নেই। মানুষকে সে হৃদয় দিয়ে প্রাণের তন্তু দিয়ে ঠিক অবুঝ লতার মতই আঁকড়ে নেয় বুকে।

আর, তার পর কলকেতা। দশ বছর অবধি যে বনে জন-কোলাহলের বাইরে একেবারে অজ্ঞানে মানুষ হয়েছে সেই বালকের চোখে হঠাৎ-দেখা এই মুখর নগরীর আলোর হাজার-নরী হার, এই সমারোহ, এই জন-কোলাহল, এই বিচিত্র সারি গাঁথা বাড়ীর ভিড় কি যে যাদু করতে পারে তা বলে বোঝান সহজ নয়।—লেনের একটা দোতলা বাড়ীতে নিয়ে ওরা আমায় তুললো। তখনকার দিনে মটরকার ছিল না, ছিল অগুন্তি

ছ্যাকরা গাড়ী। নীচে ছুটে এসে আমায় কোলে করে নিলেন এতক্ষণের রহস্যে ঘেরা রাঙা মা।

দীর্ঘছন্দ সবল বলিষ্ঠ দেহ, অপূর্ব্ব রূপ সারা যৌবন-সুঠাম অঙ্গ বয়ে ঝরে পড়ছে। বয়স আন্দাজ ১৮।১৯—অন্ততঃ এখন তাই মনে হয়। আমার জরাজীর্ণ শতছিন্ন কাপড় ছাড়িয়ে মা আমায় গরম জলের গামলায় ফেলে সাবান ও স্পঞ্জ দিয়ে ধুয়ে মুছে তুললেন, ধোয়া কাপড় পরিয়ে বুকে চেপে ধরে সে কি আদরের ঘটা। সন্তানহীনা সেই বালিকার প্রাণ হৃদয় মন সব অন্তরটুকু আমি এক মুহূর্ত্তে হরণ করে নিয়েছিলুম। দিদি এসে মুখটি চুণ করে সামনে দাঁড়াল। রাঙা মায়ের সঙ্গে দিদির আমার বনতো না, চির অভিমানিনী সহজে কোপনা দিদির সঙ্গে কারই বা তখন বনতো!

এই—গলির বাড়ীটি দিয়ে আরম্ভ হ'লো আমার কলকেতার জীবন। আমার ৫০ বছর বয়স ধরে পটের পর পট পড়েছে আর উঠেছে, বিয়োগে মিলনে অশ্রুতে নৃত্যে—জমকালো কত না ঘটনার রসবৈচিত্র্যে এ অভিনয় পরিপূর্ণ। সমুদ্রের পরপারে আমার জন্ম—সেই-ই শ্বেতদ্বীপের যক্ষপুরীতে—তাই বলছিলাম এ অভিনব জীবনের একেবারে গোড়া থেকেই অসাধারণ ও উদ্ভট, যা কারু হয় না বা খুব কম লোকের হয় তাই দিয়ে পরিচ্ছেদের পর পরিচ্ছেদ আমার জীবন-নাটিকাটি লেখা হয়েছে। বাহির থেকে দেখতে গেলে যেন এর কোন ছন্দ নেই, কোন কল্পনা-বিলাসিনী ঠাকুরমা যেন নিতান্ত অবুঝ নাতি নাতনীর

জন্তে অতি উদ্ভট আরব্য কাহিনীর মনগড়া গল্প জোড়াতালি দিয়ে বলে যাচ্ছে, যাকে কখন কোন সমালোচকের কাছে জবাবদিহী করতে হবে না। রাজনারায়ণ বসুর প্রতিভায় জাত তাঁর পাগলী মেয়ে আমার মা, প্রকাণ্ড শক্তিধর পুরুষ অথচ ভালবাসায় সৌন্দর্য্যের মোহে সহজে আকৃষ্ট নারীর অধিক কোমল উন্মার্গ-গামী কৃষ্ণধন আমার বাবা, যাঁদের ঔরসে ও গর্ভে জন্মেছেন মেজদা—মনোমোহনের মত অপূর্ব্ব কবি, সেজদা শ্রীঅরবিন্দের মত শতমুখী প্রতিভার বিরাট পুরুষ; সেই শক্তির চঞ্চল ইতস্ততঃ বিশর্পী শিখায় আমার জন্ম। তাঁদের সব দুর্ব্বলতা ও কিছু কিছু শক্তি ও প্রতিভার স্ফুলিঙ্গ নিয়ে ধূমে ও আলোকে কৃষ্ণজ্যোতির্ম্ময় আমার এই সত্তা জন্মেছে। এর কাহিনী বলা কি সহজ? না, তার সব কয়টি পাতা এই ক্রূর জগতের সামনে খুলে দেখাবার জিনিস? রূপে ঢল ঢল কমল—বর্ণে গন্ধে সব কয়টি পাপড়িতে সমগ্র হয়েই না সে এমন অনুপম, এতখানি মনোহারী। তাকে ছিঁড়ে ছিঁড়ে শুষ্ক উদ্ভিদ-তাত্ত্বিকের দৃষ্টিতে দেখলে সে রক্ত-কমল কি তেমন অপার্থিব আনন্দ দিতে পারে? মানুষের অন্তরের আসল মানুষটির—গোপন পুরীর রাজকন্যার কথা যে সেই রকম। বইয়ের পাতায় বস্তুতান্ত্রিক প্রকাশকের আলমারীতে দপ্তরীর জঞ্জলে বাধাইয়ের বাঁধনে মোড়া যে জীবন-কাহিনী তোমরা পড় তাতে কি সত্যিকার বিদ্যাসাগরকে, আসল দেশবন্ধুকে, খাটি রবীন্দ্রনাথকে পাও? সে রকম জীবনী আজও বাঙলা সাহিত্যে কেউ লেখে নি, আর সে খাটি জীবনের

মাত্র দু'চারখানা পাতা ছাড়া এই শত সংস্কারের ঠুলিপরা বর্ব্বর জগতের সামনে কিছু ধরা যায় না। মানুষ এখনও গোটা মানুষকে সাদা প্রেমের চোখে দেখতে শেখে নি, সে তাকে দেখে হয় নীতির ধোঁয়াটে চশমা দিয়ে আর নয় ধর্ম্মের বা সমাজের কিম্বা রাজনীতির নীল বাঁকা গগল্‌সের ভিতর দিয়ে। মানুষ আজও চায় না সহজ মানুষ, জীবনের রসে ছন্দে মাধুর্য্যে বিচিত্র প্রস্ফুট মানুষ, তারা চায় তাদের ধারণা ও সংস্কারের কাঁচিতে কাটা-ছাঁটা রঙীন কাগজের ফুল।

পাঁচ

—গলির বাড়ীখানায় আমার কলকেতা আসার পর অল্প দিনই আমরা ছিলুম। সে বাড়ী ছিল ভূতের বাড়ী। রাত্রে একটি মেয়ে মল বাজিয়ে নাকি ঝমর ঝমর করে সারা বাড়ী-খানায় বেড়াতো। একদিন আমার বেশ মনে আছে রাত্রে সোরগোল করে সবাই জেগে উঠলো, শোনা গেল চঞ্চলা সে মেয়ে নীচের চৌবাচ্চা থেকে বালতি বালতি জল তুলে তেতলার ছাদে সিঁড়ি অবধি ভিজিয়ে দিয়েছে। মানুষ ছুটোছুটি করে ওপরে গেলে নীচে ঝমর ঝমর করে মল বাজে, নীচে এলে মাঝের তলায় বাজে, মাঝে এলে ছাদে গিয়ে রুণ্ ঝুণ্ করে শব্দ কোথায় হারিয়ে যায়। ঐই বাড়ীতে ঘুমের ঘোরে আমার মনে হতে লাগল কে যেন আমায় ডাকছে, সে ডাক যেন না শুনে উপায় নেই, যেতেই হবে আমায় সেই অজানা অচেনা

ডাকের অনুসরণ করে। রাত্রে ঘুমের ঘোরে আমি উঠে জাগা মানুষের মত ঘুরতুম somnambulismএর মোহে, দশ বার জন লোক মিলে আমাকে এনে খাটে শোয়াতে পারতো না, এত জোর আসতো আমার মত জীর্ণ শীর্ণ কৃশকায় বালকের শরীরে। একদিন একেবারে নীচে নেমে বাবুর্চ্চিখানার উঁচু চুলোর গন্‌গনে আগুনের কাছে চলে গেছিলুম।

বোধ হয় এই সব কারণে ও-বাড়ী ছেড়ে দিয়ে গোমস্ লেনের বড় বাঙলো প্যাটার্ণের একতলা বাড়ীতে আমাদের আসা হয়েছিল। এমনি আমাদের অদৃষ্ট—দেখা গেল সে বাড়ীতেও আছে ভূতের বাথান। সে অপূর্ব্ব ইতিহাস পরে বলছি।

আমাকে বাবার যে বন্ধুটি রোহিণী থেকে নিয়ে এলেন তাঁর নাম ছিল চিন্তামণি ভঞ্জ চৌধুরী; খুলনার তিনি ছিলেন এক দুঃস্থ ক্ষুদে জমিদার,—বাবার এক গ্লাসের ইয়ার। গাঢ় শ্যামবর্ণ মোটা সোটা গোলগাল ভুঁড়েল মানুষটি, গোল নাক—bottle nose যাকে বলে; চিন্তামণি ছিলেন বড় রসিক লোক, তাঁর সঙের মত হাবভাবে সবাই হেসে কুটিপাটি হ'তো। রহস্য করে তিনি দিদিকে বলতেন 'মাসী', দিদিও রেগে কাঁই হতেন তাঁর গায়ে-পড়া রসিকতায়, দু'জনের কাণ্ড দেখে সবাই হেসে গড়াগড়ি দিত। আমি কলকেতায় আসবার এক মাস আন্দাজ পরে একদিন ভোর চারটের সময় ঝাঁকড়া-চুল বেচো কুকুরটা ডাকাডাকি ঝাঁপাঝাঁপি জুড়ে দিল। সবাই বুঝলো খুলনা থেকে বাবা এসেছেন, বাবার সাড়া পেলেই কুকুরটা ঐ রকম লম্ফ

ঝম্ফ সুরু করে দিত। এমন কি, তিনি যখন তার দৃষ্টির বাইরে আছেন—দারোয়ান গেটও খোলে নি, তখনই সে টের পেত যে তার মনিব এসেছে।

আমার সজ্ঞানে এই প্রথম বাবার কলকেতার বাড়ীতে আসা —সে এক মহোচ্ছব ব্যাপার। তাঁর হারানো সন্তানকে ফিরে পাবার আনন্দে আমাকে সে কি আদরের ঘটা! বাবার সঙ্গে সঙ্গে বাড়ী ভরে গেল বিস্কুট পনির মাখম ফল মূল তরি তরকারী আদি সুখাদ্যের প্লাবনে। দেখলুম বাবার কাছে দিদির ও আমার সমান আদর, সে ভালবাসা মায়ের স্নেহের মত একচোখো নয়, কোন প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখে না বলেই বাবার সে ভালবাসা প্রতিদানে বঞ্চিত হলেও কারু ওপর বিরূপ হয় না। তারপর থেকে অনেক পরিবারে অনেক ক্ষেত্রে দেখেছি ভালবাসার এই কাঙাল ভিখারীর রূপ, কবিস্তুতি ও কিম্বদন্তির দ্বারা আকাশে তুলে ধরা মাতৃস্নেহ—তাও যে কতখানি স্বার্থপর হতে পারে তা' বেশ বোঝা যায় যখন দেখি মা সেই সন্তানটিকে হৃদয়ের সব তন্তুগুলি দিয়ে জড়িয়ে বুকে রাখছেন যে তাঁকে অসহায়ের মত আশ্রয় করছে, অহরহ মন জুগিয়ে ভালবাসার সাংসারিক প্রতিদান দিচ্ছে। যে ছেলে বা মেয়েটী একটু রাগী বা একবগ্‌গা তাকে মা বাপের কাছে সইতে হচ্ছে তাড়না গঞ্জনা আর অবহেলা। তবু বাধ্য মমতাময় সন্তানকে ফেলে অবাধ্য চরিত্রহীন সন্তানকেই মা যে কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ হয়ে চিরটা কাল ভালবেসেই

চলে, সে হচ্ছে একান্তই প্রকৃতির বশে। ঠিক দৈহিক ক্ষুধা তৃষ্ণার মত আমাদের বুভুক্ষু হৃদয় ও প্রাণের আছে দুর্দম বেগ যা' অনুপযুক্ত নির্মম মানুষের কাছেও আমাদের কেশাকর্ষণ করে আত্মসমর্পণ করায়,—তা সে স্বামী হোক, পুত্র হোক, বন্ধু হোক, প্রণয়ী হোক, সামাজিক হিসাবে প্রণয়ের যত বড়ই অপাত্র হোক না কেন—প্রণয় বা স্নেহ ভালবাসা পাত্রাপাত্র বাছে না—cupid is blind, অন্ধ লতার মত কাঁটা গাছকেও সে অবাধে আশ্রয় করায়। তারপর এদিক দিয়ে আরও অনেক জটিল তত্ত্ব আছে উদ্ঘাটন করবার। এ জগতে কে যে কাকে ভালবাসে, কার সত্তার কোন্ স্তর থেকে দুর্দম টান এসে আর একজনের কোন্ দিকটা বিহ্বল করে তোলে তার ওপর সমস্ত ব্যাপারটা নির্ভর করে। সে কথা প্রসঙ্গান্তরে বলবো।

মাসের মধ্যে দু'একবার বাবা আসতেন আর ২।৪ দিন থেকে চলে যেতেন। কলকেতায় থাকার সময়ে তাঁর সঙ্গে আমরা যেতুম গড়ের মাঠে হাওয়া খেতে খোলা ফিটনে বসে, এই সময়টির জন্যে সাহেব আমার tip-top বাবার পাশে মা বসতেন বুক-খোলা গাউন পরে নানা ফুল-ফলে ভরা লেডিজ হ্যাট মাথায় দিয়ে রুমাল হাতে। সে বেশেও রূপসী মা আমার গড়ের মাঠ ও ইডেন গার্ডেন আলো করে চলতেন তাঁর সম্রাজ্ঞীর বাড়া লাবণ্যে ও শ্রী-গরিমায়। এই মা যে কে, কোথা থেকে এসে কবে আমার বাবার শূন্য জীবন সুখের প্লাবনে ভরে দিয়ে তাঁর ভাঙ্গা সংসার আবার গড়ে তুলেছিলেন



পিতা স্বর্গীয় কৃষ্ণধন ঘোষ

তা' অনেকদিন আমি জানতুম না। মায়ের কুলজা সন্তানের কাছে কি অমন করে খোঁজবার জিনিস? তা খোঁজে কেবল মরালিটির হিষ্টীরিয়া-গ্রস্ত এই সমাজ, আর তার ফিটফাট ধোপদস্ত স্তম্ভগুলি। মা কি জানিস তা আমি আমার শৈশব ভরে কখনও জানি নি। এই অজানা রাঙা-মা আমার সে আস্বাদ আমায় প্রথম দেন। আমি সত্যি সত্যিই হয়েছিলুম তাঁর চোখের মণি।

দু' তিন মাস পরে পরে একবার করে আমরাও যেতুম খুলনায় বাবার কর্ম্মস্থলে। সে খড়ের ছাওয়া বাড়ীখানি ছাবর মত এখনও আমার চোখের সামনে ভাসছে। সামনে বাগান, বাড়ীতে উঠতেই একটুখানি বারাণ্ডা; তার একপাশে বাবার বসবার ঘর। ভিতরে বড় হল ঘর, তাতে ডিনার টেবিল। হলের দু' পাশে দু'খানি করে ঘর, ভিতর দিকেও একফালি বারাণ্ডা। প্রকাণ্ড কম্পাউণ্ডের মধ্যে এই বাড়ীখানি। দূরে বাবুর্চিখানা, ঘোড়ার আস্তাবল, মুরগী-হাঁসের ঘর, গোশালা। কম্পাউণ্ডে ঢুকতে বাঁশের জাফরী ঘেরা লতায় ঢাকা একটি বসবার কুঞ্জ। এই ছিল খুলনার প্রবল প্রতাপ মুকুটহীন রাজা ডাক্তার কে ডি ঘোষের আস্তানা। বাবা আমাকে পাশে বসিয়ে টমটম্ হাঁকিয়ে কাজে বের হতেন আর দেখতুম দু'ধারে মানুষ শ্রদ্ধায় নুয়ে পড়ছে, সমস্ত পথ তিনি যেতেন মাথার টুপি তুলতে তুলতে সেই মুহুর্মুহু নমস্কার, সেলাম ও প্রণামের প্রত্যভিবাদন দিতে দিতে। এজলাসে বসে মাজিষ্ট্রেট

যখন বিচার করতেন তখনও বাবা থাকতেন চেয়ার নিয়ে তাঁর ডান পাশে বসে—পরামর্শ দাতা রূপে। জেলে সিভিল সার্জ্জন-রূপে বাবাই ছিলেন হর্ত্তা কর্ত্তা বিধাতা, জেলার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আদি কর্ম্মচারীরা ছিল নামকাওয়াস্তে। পি ডবলিউ ডি, স্কুল, ডিস্পেন্সারী যা' কিছু খুলনার ছিল সর্ব্বত্রই সর্ব্বঘটেই এই মুকুটহীন রাজার ছিল দোর্দ্দণ্ড প্রতাপ—অদ্ভুত একাধিপত্য।

কলকেতার বাড়ীতে একদিন বাবা এসেছেন। গভীর রাত্রে একটা গোলমাল শুনে আমি জেগে উঠে শুনলুম ভূত বেরিয়েছে, আমাদের দারোয়ান তেওয়ারীজীর নাকি এসে পায়ের বুড়ো আঙ্গুল চেপে ধরেছিল। কলকেতার গোমস্ লেনের বাড়ীখানি ছিল বাঙলো প্যাটার্ণের। সামনে গেট, একটু উঠান পার হয়ে কয়েক ধাপ সিঁড়ি, তারপর বারাণ্ডা; সামনে একটি বড় হল ঘর, তার পরে পাশাপাশি দু'খানি এবং তারও পরে ঠিক অমনি দু'খানি মোট চারখানি ঘর। বারাণ্ডাটি চলে গেছে ঘুরে এই হল ঘর ও দু'খানি ঘর বেড়ে পিছনে বাবুর্চ্চি-খানার দিকে। এই দিকে ছাদ, কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে প্রথমে নীচু রান্নাঘর ও দাসদাসীদের ঘরের (out houseএর) ওপর এবং পরে আসল বাড়ীটির ওপর আর এক প্রস্থ ঘুরে উঠেছে প্রকাণ্ড ছাদে। গেট দিয়ে ঢুকে দুই দিকের বারাণ্ডা বেয়ে রান্নাঘরের নীচু উঠানে নেমে আবার একটি সরু রাস্তা বেয়ে সমস্ত বাড়ীখানিকে পাক দিয়ে আসা যায় পুনশ্চ সদর গেটের কাছে। ভূতটি নাকি কুলি ভূত, এই বাড়ী হবার সময় সেই যে

অসম্পূর্ণ ছাদ থেকে পড়ে তার অস্থি দিয়ে এই বাড়ীখানি গড়বার সাহায্য করে গেছে সে মায়া আজও সে কাটিয়ে উঠতে পারে নি। রাত বারটা একটার সময় সবাই দেখে সে তার বাবরী চুল নিয়ে খাটো হাতকাটা কুর্ত্তা পরে কালো মুস্কো জোয়ান বলিষ্ঠ শরীরটির রূপে দশ দিক আঁধার করে এসে গেট দিয়ে বাড়ীতে ঢোকে এবং বাড়ীটি একবার প্রদক্ষিণ করে বেরিয়ে যায়, কখনও বা ছাদে উঠে ছোট ছাদের গায়ে গয়লাদের বাড়ীর দেওয়াল বেয়ে গজানো যজ্ঞী ডুমুর গাছটীর কাছে গিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায়। আশ্চর্য্য এই জাতের গণ্ডী,—এই আভিজাত্য ও দারিদ্র্যের সীমা; ভূতের দেশেও এটা অক্ষুন্ন ভাবে টিঁকে আছে। এখানকার রাজা মরে সেখানেও মুকুট মাথায় দণ্ড হাতে বেড়ায়, এখানকার শ্রমজীবীরা সেখানেও বোধ হয় গতর খাটিয়ে খায়। আমাদের দারোয়ান রামরাজ তেওয়ারী খুব ওস্তাদ লাঠিখেলোয়াড় ছিল, সাহসীও কম ছিল না, তার কাছে কে নাকি এই ভূতের গল্প করায় সে জিদ করে সেই দিন তার খাটিয়াটিকে বারাণ্ডায় আড়াআড়ি ভাবে রেখে ভূতের পথ রুখে শুয়েছিল। রাত্রে যথা-সময়ে ভূতপ্রবর এসে এই অনধিকার চর্চ্চা ও tresspassএ চটে তেওয়ারীজীর পায়ের বুড়ো আঙুলটা শুধু চেপে ধরা এবং তাতেই তেওয়ারীজীর জেগে পৈতা হাতে রামনাম জপ। সোরগোলে তো আমরা সব উঠে পড়লুম; ততক্ষণ ভূতটি ছাদে উঠে ঐ ডুমুর গাছে মিলিয়ে গেছে।

আমাদের এক মুসলমানী ঝি ছিল, সে একরোখা মেয়ে, কথাটা শুনে নথ নেড়ে তেওয়ারীকে ঠাট্টা করে দু'শ কথা শুনিয়ে দিলে। তেওয়ারীজী ঐ ছাদে ডুমুর গাছের কাছে যাবার জন্যে তাকে challenge করায় রাগী মেয়েটাও রাগ করে সিঁড়ি দিয়ে উঠে সরাসর চলে গেল অকুস্থানে এবং তখনি আবার যথাশাস্ত্র ফিরে এসে ঘাড় মুড় ভেঙে পড়লো ফিট হয়ে। তার জ্ঞান করাতে আধঘণ্টাটাক লেগেছিল। তারপর থেকে দু এক দিন রাত্রে উঠে দেখতুম দরজার খড়খড়ি খুলে বাবা মাঝে মাঝে বারাণ্ডার দিকে দেখছেন আর গুলিভরা পিস্তল হাতে ঘরের মধ্যে ঘুরছেন। ভূত কি স্বদেশী বিপ্লবী, যে, গুলি করলেই 'বন্দে-মাতরম্' বলে ধরায় লুটিয়ে পড়বে আর একটা পিলে চমকানি গোছের confession করে বুভুক্ষু সংবাদ পত্রগুলির লম্বা চওড়া (flaring headlines) স্তম্ভের খোরাক যুগিয়ে যথাশাস্ত্র মরে যাবে ?

এই গোমস্ লেনের বাড়ীতে এক বুড়ী গয়লানী দুধ যোগাতো, তার নাকে ছিল এক প্রকাণ্ড ফাঁদী নথ। অতবড় নথ আর আজকাল কোথাও বড় একটা দেখা যায় না। মা ও সবাই আমায় ক্ষেপাতো ঐ বুড়ী গয়লানীকে আমার বৌ বলে আর গয়লানীও আমাকে চুমো খাবার জন্যে ধরতে আসতো তার শিরাকীর্ণ হাত দুটো মেলে। আমি চিল চীৎকার করে চেঁচিয়ে দিতুম কান্না জুড়ে। ঐ ডুমুর গাছটার ও-ধারে ছিল বুড়ীর বাড়ী, সেইখানে থাকতো তার এক গোয়াল গাই আর বুড়ো

অথর্ব্ব কেসো রুগী গয়লা। আমাদের বাড়ীর আর এক দিকে থাকতো আর এক বুড়ী, তার ছিল ৪০টা বেরাল; সে বুড়ী ছাদে বড়ী বা আমসত্ত দিলে সেই চল্লিশটা বেরাল ঘিরে বসে কাক তাড়াতো এবং পাহারা দিত। এই গোমস্ লেনের বাড়ী থেকে সেজেগুজে আমরা সাহেবী চালে ফিটন গাড়ীতে চড়ে যেতুম মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে বাজার করতে আর ময়দানে হাওয়া খেতে। তখন ট্যাক্সী মটর লরী বাস প্রভৃতি গন্ধভরাগিণীওয়ালা পদার্থ ছিল কল্পলোকে, কলকেতা সহর ছিল ছ্যাকরা গাড়ীর ছ্যাড়-ছ্যাড়-ছ্যাড় রবমুখর স্থান।

আমাদের গোমস্ লেনের বাড়ীর সংসারে যে ক'জন ছিল অন্তরঙ্গ তাদের ৩।৪ জনকে আমার মনে আছে। বাবা একটী দরিদ্র ব্রাহ্মণ সন্তানকে লেখাপড়ায় সাহায্য করতেন, সে আমাদের সংসারে আমাদেরই একজন হয়ে থাকতো। বড় লোকেরা যেমন গরীব ছেলে পোষে আর তাকে বাজার সরকারের মত খাটায় তেমন নয়,—তাকে ঘরের ছেলের মত এক অন্নে সেণ্ট জেভিয়ার কলেজে পড়ানো হতো। তার নাম ছিল যদুগোপাল চট্টোপাধ্যায়। এই ছেলে পরে শুনেছি জয়পুর কলেজের অধ্যাপক হন। এখনও তিনি জীবিত, মাঝে মাঝে তাঁর খবর পাই কিন্তু কোথায় যে কি করেন যদুদা' এখন তা' এতবার শুনেও কিছুতেই আমার মনে থাকে না। যদুগোপাল ছিল রোগা, শান্ত শিষ্ট, কোমল স্বভাবের স্বল্পভাষী ছেলে, মুখে থাকতো তার সর্ব্বদা হাসিটি লেগে।

আমার আত্মকথা

মায়ের তাসের আড্ডায় একজন ইহুদী ছেলে আসতো যেতো, জিনের ইজের কোট পরা, মাথায় জরিদার ইহুদী টুপী, মুখে দিবারাত্র সিগারেট, শিস আর গান; চঞ্চল, সর্ব্বদা হাসি-খুসী আমোদ ইয়ারকীতে মশগুল; এ ছেলেটি এলেই দুপুরে তাসের আড্ডা জমে উঠতো খুব। ছেলেটা ভবঘুরে, কোথায় ব্যাণ্ডের দলে ঢুকে ক্ল্যারিয়নেট বাজাতো, আর একটি ধনী ইহুদীর পরমা সুন্দরী মেয়ের প্রেমে হাসি খুসির ফাঁকে ফাঁকে দীর্ঘশ্বাস ফেলতো। একদিন তার মায়ের সঙ্গে মেয়েটি আমাদের বাড়ীতে নিমন্ত্রিত হয়ে এসেছিল, আমাদের সঙ্গে হুটোপাটি করে লুকোচুরি খেলেছিল। লম্বা ছিপছিপে, রসে ঢলঢল লতার মত, গৌরাঙ্গী, কালো নিবিড় চোখ, প্রবালের ঠোঁট, একমাথা ঘনকৃষ্ণ চুল,—এই ছিল ইহুদী ছোকরার উপাস্য দেবী —তার জীবনের সুদূর দিগন্তের চাঁদ। তারা বড়লোক আর এ বেচারী গরীব, তার ওপর সে জীবনের জলের ওপরে ভাসমান বোহেমিয়ান শ্যাওলা,—ব্যাণ্ড-বাজিয়ে বওয়াটে ছেলে। সামাজিক মানুষের কাছে প্রেম ভালবাসা জাতীয় আকাশ কুসুমের চেয়ে মোটা মাহিনার চাকরীর দর অনেক বেশি। মেয়ের জীবনের সুখ মানেই সোণা দানা পোলাও পরমান্ন দাস দাসী বাড়ী গাড়ী, ছেলেটি হয়তো বড় ঘরের পাঁঠা—মদে ও আনুষঙ্গিকে ডুবে আছে; তা হোক, তবু কত বড় ঘর! তাই বলি মানুষের চেয়ে শিক্ষিত মর্কট আর আছে?

তার ট্যারা ব্যাঁকা বাঙলা উচ্চারণ দিয়ে এই ইহুদী যুবক যখন গান ছাড়তো,

ও আমার সাধের বকুল ফুল !
স্নানের ঘাটে নাইতে গিয়ে
হারালেম দুকুল।

তখন আড্ডায় আমাদের হাসির দমকা হাওয়া বয়ে যেত। বাইরের ঘরে একটা ক্যাম্প খাটে মাঝে মাঝে রাত্রে এসে শুয়ে থাকতো, কখনও বা ড্রইংরুমে বা পাশের ঘরে সেই খাটটা টেনে নিয়ে রাত কাটিয়ে দিত। তাসখেলায় সে প্রায়ই হারতো আর হারলেই বুক চাপড়ে নেচে কুঁদে পাছা থাবড়ে নানা রকম দুঃখের সং দিয়ে আমাদের হাসাতো। আমার দিদির ও মায়ের এই আমুদে ছেলেটি ছিল ব্যাঙখোঁচানী করে আনন্দ পাবার জিনিস। কলকেতার সহর ছিল তার নখদর্পণে, তাই গোমস্ লেনের সংসারে কোন দুর্ল্লভ দুষ্প্রাপ্য বস্তুর দরকার হ'লে সে কলকেতা সহর ঘুটে তা' নিয়ে আসতো।

আগেই বলেছি দারোয়ান রামরাজ তেওয়ারী ছিল খুব পাকা লাঠি খেলোয়াড়। একদিন গোমস্ লেনের পাড়ার মুসলমান ছেলেদের একটা বল এসে বাড়ীর মধ্যে পড়ে, আমি সেটা কুড়িয়ে নিই। সেই নিয়ে দারোয়ানের সঙ্গে ছোঁড়াদের বচসা হওয়ার পর প্রায় দু' তিন শ' মুসলমান এসে আমাদের বাড়ী ঘেরাও করে। রামরাজ দেখি হঠাৎ ফটক একেবারে হাঁ করে খুলে দিয়ে তার পাকা বাঁশের তারের গাঁটবাধা তেল

চকচকে লম্বা লাঠি গাছটা নিয়ে সাম্‌নে দাঁড়াল আর হেঁকে দিল—কোন বাপের ব্যাটা যদি ভিড়ের মধ্যে থাকে একবার এগিয়ে আসুক। সেই ভরা দুপুরের রোদে তেওয়ারীজীর লাঠি ঝক্ ঝক্ করে ঘুরতে লাগল পাঁচ সাত হাত জমি বেড়ে, লাঠি বড় দেখা যাচ্ছিল না, দেখা যাচ্ছিল একটা রৌদ্র প্রতিফলিত চক্র মাত্র। বলা বাহুল্য কেউ এগিয়ে এলো না, লাঠিখেলার তারিফ শতমুখে করতে করতে জনতা গেল ভেঙে। জনতা ভেঙে যাওয়ার আরও একটা কারণ ছিল এই যে, পুলিশে খবর গেছিল, লাল পাগড়ী আসার আগেই অকুস্থান ত্যাগ করে নির্ব্বিঘ্ন নীড় আশ্রয় করাই ফুর্ত্তিবাজ জনতার তখন উচিৎ মনে হয়েছিল। বাবা মারা যাবার পরে এই দারোয়ানজীর ইতিহাস খুব সুন্দর, তা' যথাস্থানে পরে বল্‌বো। সে রাঙা মাকে নিজের মায়ের মতই শ্রদ্ধা করতো।


SARASWAT LIBRARY
Estd:-1919.
MAKARDAH-HOWRAH.

ছয়

আমার এই ঝড়ো অশান্ত জীবনে একটানা সুখের নীড় দুই তিনবার ছাড়া জোটে নি। নিজের মায়ের কাছ থেকে রাঙা মায়ের কাছে এসে গোমস্ লেনের এই আনন্দের হাট আমার অদৃষ্টে জুটেছিল মাত্র ২।৩ বছরের জন্যে। এ জীবনের যে কত কি বলবার আছে অথচ সে সব ঘটনা তুচ্ছ সাংসারিক দৈনিক জীবনের ঘটনা—অনাদরে পায়ের তলায় ফোটা ঘাসের ঘন নীল বা রক্তরাঙা ক্ষুদে বুনো ফুলটুকুর মত। আমাদের প্রাণের মাঝে যেন এক থিয়েটার সাকার্সের বাতিকওয়ালা অশান্ত জীব আছে, যে কেবলি চায় পিলে-চমকানো ঘটনা, মেলো ড্রামা, 'হা নাথ, হা প্রিয়ে, বিষ ভক্ষণ ও মৃত্যু'—এমনি সব নাটুকে ব্যাপার, তার চাই—ঘোড়ার পিঠের ওপর থেকে পনর হাত উঁচু অবধি লাফ খেয়ে শূন্যে পরমা সুন্দরী নীল পরীর গালে

চুমু খেয়ে আবার সেই ঘোড়ার পিঠে এসে বসতে হবে; তার চাই ভীমসেনী বীর, ঘটোৎকচ রাক্ষস, চারটে নায়ক নিয়ে একটা মেয়ের নাকানী চোবানী খাওয়া। পাঠকদের মধ্যে এই জাতীয় প্রকৃতি যাঁদের বেশি তাঁরা আমার সাইক্লোনিক জীবনের এই ক'টা পরিচ্ছেদ বাদ দিয়েই পড়বেন; মাঝে মাঝে শান্ত একটানা দিনের এই রকম ছুটিটা ছাটাটা পেয়েছিলুম বলেই পরে কর্ম্মের টানাপোড়েনে অতখানি ধকল সয়ে আজও টিকে আছি।

এই গোমস লেনের বাড়ীতে আর যারা আসতো যেতো তাদের মধ্যে ছিল এক পুলিশের সাব-ইন্স্পেক্টরের পরিবার। এরকম strange bed fellows আমাদের জীবনে অহরহই জুটছে, নইলে কে ডি ঘোষের মত অতবড় সাহেবের পরিবারের বন্ধু হ'লো কিনা নীরদের মা! পুলিশ দারোগাটি ছিলেন মোটা সোটা, দীর্ঘাকার, বেশ একটু স্থূলবুদ্ধি জীব এবং বেহিসেবী পাড় মাতাল। তাঁর বৌটি ছিল ছোট্ট খাট্ট, সদাই দুঃখে ম্রিয়মান অথচ সদাই সুখের কাঙাল জীব। তাদের ছেলে হয়েছিল চার পাঁচটি, মেয়ে ছিল বলে আমার স্মরণ নেই। স্বামীর অত্যাচারে ও মাতলামোর দুঃখে মেয়েটি আত্মঘাতী হতে গেছিল দু' তিনবার। এখনও আমার মনে পড়ে তার গলায় ভীষণ একটা কাটার চিহ্ন, একবার গলায় ক্ষুর চালিয়ে এমন কেটে ফেলেছিল যে প্রাণে প্রাণে বেঁচে উঠতে লেগেছিল ছয় মাস; আফিং খেয়ে মরতে সে প্রায়ই যেতো। আমার "মুক্তির

দিশা।” গল্পের বইএ ‘পাতাল পুরীর দুয়ার’ গল্পে দেখিয়েছি—অন্ধ এক যক্ষপুরী আছে আমাদের প্রাণ সত্তার তলায়। সেখান থেকে আসে দুঃখের হা হুতাশের কালো ঝড় আর আত্মঘাতের প্রেরণা। একবার যে সংযম ও মনের বাঁধ হারিয়ে এদের নিশি-ডাকে সাড়া দিয়েছে তাকে এরা ক্রমে পেয়ে বসে, তখন হয় হিষ্টিরিয়া বা নিউর‍্যাস্থেনীয়ার আধপাগল রোগীর সৃষ্টি। তাকে কে যেন ক্রমাগত ডেকে ডেকে বলতে থাকে, “আর কেন, তোমার তো সুখসাধ সব ফুরোলো; আর কেন, এইবার জুড়োও।” জগতে দুঃখ আমাদের পাশে পাশে ছায়ার মত চলছেই, দুঃখে ভেঙে পড়তে নেই; মনের জোর নিয়ে দুঃখের দিকে যে হেসে চাইতে শিখেছে তার দুঃখের বোঝা হালকা হয়, সুখের দিন আবার আসেই। কারণ, আসল দুঃখটার পরিমাণ খুব কম, আমাদের মন-প্রাণের দুশ্চিন্তা, নৈরাশ্য ও জ্বালা দিয়ে ওটাকে আমরা বাড়িয়ে তুলি অসম্ভব রকম বেশি।

পুলিশ দারোগাটি শিয়ালদহের থানায় ছিলেন চাকরীতে বাহাল, মদের মাত্রার তারতম্য অনুযায়ী কখন হতেন সাব-ইন্সপেক্টর আর কখন হতেন হেড কনষ্টেবল। আমাদের দুই পরিবারে ছিল ঘন ঘন যাতায়াত! তাদের দু’একটি ছেলে এসে কখনও কখনও আমাদের গোমস্ লেনের বাড়ীতে থাকতো; তাদের বাড়ী থেকে আসতো বড়ই মুখরোচক লুচী, চচ্চড়ি, ছ্যাচড়া, আলুর দম, ক্ষীর ইত্যাদি; চপ, কাটলেট, কেক, বিস্কুট খেয়ে খেয়ে আমার শ্রান্ত জীবে তা’ যে কি মধুর লাগতো

তা' ব'লে বুঝান অসম্ভব। সব আনন্দই আসলে ব্রহ্মানন্দেরই মত মুকাস্বাদনবৎ—অবাঙমনসগোচরম্, শুধু মাঝখান থেকে জীব বাবুজীউ মেরে দেন আনন্দটি। এই আত্মাপক্ষীটি কোন্ অচিন লোকের নন্দন কাননের শুকসারী তা জানি নে, কিন্তু রক্ত মাংসের এই চোদ্দপোয়া দেহকলটি বানিয়ে তা'তে কয়েকটি অতিমাত্রায় স্পর্শালু hypersensitive মাংস খণ্ড জুড়ে দিয়ে এবং চারধারে রূপ রস স্পর্শ গন্ধের লোভন আয়োজন সাজিয়ে কি আপ্রাণ চেষ্টাই চলছে সেই অচিন পাখীকে মাটির ধরায় আটকে রাখতে। কেন এত প্রলোভন, এত সাধাসাধি, এত আদর সোহাগ কে জানে? এত আয়োজন ফাঁসিয়ে দিয়ে সে কিন্তু একদিন পিঁজরে কেটে অচিন লোকে উড়ে যাবেই।

এই পরিবারে একটি ছেলে রোজ রাত্রে ও দিনে চর্ব্ব্য চোষ্য আহার করে এক মিনিট পরে সব বমি করে আসতো; এই ছিল তার নিত্য কার্য্য অথচ শরীর ছিল তার আমাদের চেয়ে মোটা সোটা। ঐ কয়েক মিনিটে তার সজাগ দেহযন্ত্র প্রাণ ধারণের আবশ্যক মত উপাদান গোছালো গৃহিণীর মত সরিয়ে নিতো বোধ হয়। কোন ডাক্তারেই ধরতে পারে নি ছেলেটার কি এ রোগ এবং কি তার প্রতিকার।

রোহিণী থেকে আমার আসবার বোধ হয় কয়েক মাস কি প্রায় এক বছর পরে একদিন ঘুম থেকে জেগে মা চোখের জলে ভেসে বললেন, যে তিনি স্বপ্ন দেখছিলেন, একটা গভীর অতল সমুদ্রে আমি তলিয়ে যাচ্ছি আর নিঃশাস রোধ করে মা ডুবে

চলেছেন ছু'হাত বাড়িয়ে আমাকে ধরতে। আলো বাতাসহীন সেই নির্ম্মম অকূল জল—তল যার খুঁজে পাবার আশা ছুরাশা, তার গ্রাসে ছেলে হারাবার আকুল আশঙ্কায় কি যে সে বুকে খিল-ধরা ডুব। জেগে উঠেও মা থর থর করে কাঁপছিলেন আর আমায় বুকে জড়িয়ে ধরে চুমোয় চুমোয় সারা অঙ্গ আমার ছেয়ে দিচ্ছিলেন। সেই দিন সন্ধ্যায় আমার এলো জর এবং শীঘ্রই তা টাইফয়েডে দাঁড়ালো।

যখন আমার জ্ঞান হ'লো তখন দেখলুম বাবার খুলনার খড়ো বাড়ীতে একটা ঘরে বিছানার সঙ্গে মিশে হাড় পাঁজরের একটা ক্ষীণ বোঝা হয়ে আমি পড়ে আছি। মা রয়েছেন মাথা কোলে নিয়ে মুখের ওপর ঝুঁকে, তাঁর সে দীপ্ত রূপ অনাহারে অনিদ্রায় গেছে কালি হয়ে। ক্রমে ক্রমে শুনলুম একুশ দিন নাকি আমি অচেতন ছিলুম। যে দিন নাড়ী ছেড়ে যায় ডাক্তাররা ছুঃখে উন্মাদের মত বাবাকে ঘরে চাবী দিয়ে বন্ধ করে রেখেছিলেন। মা এই একুশ দিন আমার শয্যাপ্রান্ত ছেড়ে ওঠেননি বললেই চলে। মৃত্যুর অন্ধপুরী ছাড়িয়ে সেই আমার প্রথম ফিরে আসা, জীবনে রোগে মৃত্যুদণ্ডে এরকম আরও ছু' তিনবার হয়েছে। ফিটের ঘোরে আমি কেবল দেখতুম আমার শরীরটা দশ বিশ মণ ভারী, এক এক খানা হাত পা যেন লোহার বিম, তোলা শক্ত। আলনার কাপড়গুলো কেবলি মানুষ হয়ে ঝুপ ঝাপ করে এসে মাটিতে আমার চারদিকে পড়ছে। রোগ সেরে ভাত খাবার জন্যে সে কি ব্যাকুল কাকুতি মিনতি।

ভাতের শোকে মনে হতো সবাই আমার পরম শত্রু। ডাক্তাররা বলেছিল এ কাল রোগ থেকে ছেলেটি উঠবে একটা অঙ্গহানি নিয়ে, সেই থেকে আমার চোখের দৃষ্টি গিয়ে short sight এর ব্যাধি জীবনসঙ্গী হ'লো।

এই সময়ে জীবনের এই ছু'বছরে দেখেছি মায়ের সে কি আপ্রাণ চেষ্টা বাবাকে মদ ছাড়াতে, সুপথে আনতে। কলকেতা থেকে না বলে কয়ে হঠাৎ খুলনার বাড়ীতে এসে পড়তেন বাবার নৈতিক অনাচার ধরবার জন্যে। এই দৃপ্তা গরিয়সী মেয়েটির পদ্ম চোখের ভ্রূকুটি আর অশ্রুকে বাবা যে কি মর্ম্মান্তিক ভয়টা করতেন তা' ছিল একটা দেখবার জিনিস। খুলনায় মা থাকলে বাবার হুইস্কির বোতল থাকতো মায়ের কাছে, অনেক কাকুতি মিনতি করে ভিক্ষাস্বরূপ দিনে এক আধ পেগ পেতেন। অর্থ, সম্পত্তি ও জীবিকার উপায়গুলি করায়ত্ত করে পুরুষ সমাজ নারীকে করে রেখেছে তার গলগ্রহ, অন্ন-বস্ত্রের জন্য তাদের একান্তই মুখাপেক্ষী; ভারতের মত দেশে নারী আবার শাস্ত্রে অনধিকারী, শিক্ষা-দীক্ষায় বঞ্চিত, পুরুষের অন্তঃপুরবন্দিনী অসূর্য্যম্পশ্যা ভোগপুত্তলী। তবু এত করে এত আট-ঘাট বেঁধেও পুরুষ তার স্বাভাবিক অর্দ্ধাঙ্গিনীকে সব ক্ষেত্রে পায়ের দাসখৎ লেখা দাসী করে উঠতে পারে নি। যেটুকু সঙ্কীর্ণ ক্ষেত্র আমরা তাদের দিয়েছি সেই অন্তঃপুরটুকুর মধ্যেই ওরা হয়ে রয়েছে নিজের শক্তি ও মহিমায় সম্রাজ্ঞী। বড় বড় কর্ত্তারা হাঁক-ডাক করে গৃহিণীর এই রাজ্যে অনধিকার চর্চ্চা করতে

গিয়ে ল্যাজটি গুটিয়ে থোঁতা মুখ ভোঁতা করে ভাল মানুষের মত বাইরের ঘরে ফিরে এসে বসেন। মানুষের মাঝে—নারীর মাঝে কি একটা অপরাজেয় বস্তু আছে যাকে কিছুতেই এঁটে ওঠা যায় না। কত বড় বড় দাম্ভিকের দম্ভ চূর্ণ হয়ে গেছে ঐ স্ফটিকস্তম্ভে লেগে, মানুষকে বন্দী করবার ব্যর্থ প্রয়াসেরও শেষ নেই আর অবলীলায় অষ্টপাশ তার ছিঁড়ে ফেলে মানুষের মুক্ত হওয়ার ইতিহাসেরও অন্ত নেই।

গোমস্ লেনের বাড়ীতে সংসারের কাজকর্ম্মের পালা সাঙ্গ করে অবসর বিনোদন হতো তাসের আড্ডা জমিয়ে, হারমনিয়ম বাজিয়ে আর নভেল পড়ে। মায়ের কাছে কেউ একজন বসে রমেশচন্দ্রের বা বঙ্কিমচন্দ্রের নভেলগুলি পড়তো আর মায়ের সঙ্গে আমরা শুনতুম। এইখানে আমার সত্তার গোপন পুরীর কল্পনা সুন্দরীর প্রথম জাগরণ, গল্পের মোহিনী শক্তির স্পর্শে গুপ্ত কবি ও চিত্রকরের প্রথম বিস্ময়মুগ্ধ চোখ মেলা। বাবা ছিলেন ষ্টার থিয়েটারের একজন পেট্রন; খুলনায় বাৎসরিক প্রদর্শনী ও উৎসব হ'তো, তা'তে ষ্টার থিয়েটারকে বাবা নিয়ে যেতেন টাকা খরচ করে। আমাদের একটি বক্স ষ্টারে বাঁধা ছিল। সেইখানে মায়ের কোল ঘেসে বসে আমার প্রথম নাটকাভিনয় দর্শন। তখন ভাল বুঝতুম না, সেই নৃত্যগীতমুখর আলোকমালা শোভিত রহস্য-পুরীর পটপরিবর্ত্তন মুগ্ধ স্পন্দিত হৃদয়ে বসে বসে দেখতুম আর ভাবতুম, "ওরা না পারে কি?" পরের সুখ

৭

দুঃখের টান যে এমন চিত্তবিমোহন হ'তে পারে তা' প্রথম অনুভব করে সেই দশ বৎসর বয়সে আমার চোখে ধারা বইতো। হাসি অশ্রুর সুখস্রোতে নিশি ভোর হয়ে যেত। তখনও কলা রাজ্যের দু'টি বড় জিনিস—ছবি ও গানের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় নি, কিন্তু ষ্টারের রঙ্গমঞ্চের মায়াপুরীতে নৃত্য ও গীতের আমি যে প্রথম আস্বাদন পেলুম আমার এই কৈশোরের দিনে, তা খুব উচ্চাঙ্গের নৃত্য-গীত না হ'লেও আমার বালক-চিত্তকে তা' আলোড়িত মথিত করে তুলেছিল। কোথায় যেন একটি পরিপূর্ণ ছন্দেব রূপের ঝঙ্কারের রাজ্য আছে যার শিব তাণ্ডবে এ জগত ভেঙে যায়, যার রাসলীলায় এ জগত রসে মুঞ্জরিত পুষ্পিত হয়ে ওঠে, যার স্বপ্নালু স্বচ্ছন্দ গতিতে নব নব সৃষ্টিকমল অনন্ত কোন্ দিগন্ত জুড়ে ফুটে ওঠে; এ নৃত্য-গীত তারই আভাষ যেন আমাকে দিয়ে চিরজীবনের মত কবি করে দিয়ে গেল। নৃত্য-গীত বা অভিনয়ে আর্ট ও সুকুমার কলাজ্ঞান না থাকলে তা' কতখানি বীভৎস ও vulgar হ'তে পারে তা' আমাদের দেশের রসজ্ঞানহীন চাষাড়ে-বুদ্ধি শ্রোতার দলে খুব কম লোকেই বোঝে। কলাজগতে ভারতের আপামর সাধারণ এমন কি ছাত্র-সমাজও এখনও প্রায় গোমূর্খ অবস্থায় আছে, নইলে এত দিনে বাঙলা নাট্যমঞ্চের বহু রূপান্তর ঘটে যেত। তবু কিন্তু পথের পাশে নৃত্যশীলা বেদের মেয়ের কণ্ঠে ও অঙ্গলীলায় সেই পরম রসই অমার্জিত crude অবস্থায় উথলে উঠছে যা'র কথায় উপনিষদ বলে গেছেন—

আমার আত্মকথা

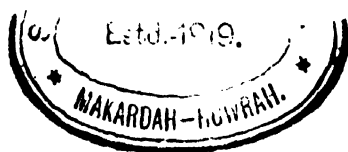
আনন্দাদেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে
আনন্দেন যাতানি জীবন্তি
আনন্দম প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি
তদ্ ব্রহ্ম।

ব্রাহ্ম সমাজের কোলে আমার জন্ম, বঙ্গদেশ ও বঙ্গসমাজ ব্রাহ্ম সমাজের কাছে অনেক কিছু পেয়েছে। কিন্তু ওর বিরুদ্ধে আমার নালিশেরও অন্ত নেই—বিশেষ করে নীতিজ্ঞানের অতিমাত্রায় আড়ষ্ট পিউরিটানী সাধারণ সমাজের বিরুদ্ধে। ঠেকায় এরা সবই করে অথচ হিন্দুদের জীবনের কত কিছুর বিরুদ্ধে নিরাকার নাক এদের কুঁচকেই আছে। থিয়েটার তার মধ্যে একটি, যেহেতু ওখানে নটীর নৃত্য হয়; অথচ নটীর নৃত্য না দেখেও ব্রাহ্ম-যুবকদের ভেতর কুরুচি ও কামবৃত্তির খেলা এক চুল কম তো দেখি নে। বাহিরটা ধোপদস্ত রেখে জেণ্টলম্যান সেজে থাকার এই যে মানবী প্রবৃত্তি এর মত হাস্যকর জিনিস আর কি আছে? হিন্দু ঘরের অনেক মেয়েকে ঝগড়া ঝাটির মাঝে তারস্বরে চোখ মুখ ঘুরিয়ে বক্তৃতা করতে শুনি যে, সে কত বড় সতী, তার অনিষ্ট করতে গিয়ে হারাণ দত্ত পড়লো আর মরলো। এই লোক-দেখানো মরালিটি সেই ধরণের নিজের ঢাক নিজে পিটিয়ে সতীর বড়াই করার মতই ব্যাপার। নটীর নাচকে ভদ্রলোকের বাড়ীর অঙ্গনে এনে এখন রবীন্দ্রনাথ অনেক তথাকথিত সুরুচিবাগীশ ব্রাহ্মের মুখ বন্ধ করেছেন, এখন ভদ্রঘরের মেয়ে ও কুলবধূও নটীর কাজে আসরে নামছেন—

তাঁদের নমস্যা পূর্ব্ববর্ত্তিনীরা ছিলেন রাজকন্যা শ্রেষ্ঠী-কন্যার দল, এই তাঁদের সব চেয়ে বড় নজির। আগেই বলেছি নারীর অঙ্গের সুললিত ছন্দোবদ্ধ গতি কতখানি কুরুচি জাগায় জানিনে, কিন্তু যে রসজগৎ সে মানুষের কাছে খুলে দেয় তা'র দাম দেয় কে? আর ঐ ভগবদ্দত্ত কুরুচিপূর্ণ বৃত্তিটা—ওটা তো সবারই কেশাকর্ষণ করে নানাবিধ কুকার্য্য দিবারাত্র করিয়ে নিচ্ছেই, ওটার হাত থেকে নিরাকার ভজেও যখন উদ্ধার নেই তখন নৃত্যগীত চিত্র প্রভৃতি কলারসের সুখে ও আনন্দে আমরা বঞ্চিত থাকি কেন?

ষ্টারে তখন কিসের পালা দেখেছি তা আমার স্মরণ নেই, তবে তাজ্জব ব্যাপার, বিবাহ বিভ্রাট আদি নক্সাগুলির কথা বেশ মনে আছে। ব্রাহ্ম-সমাজ তখন ছিল থিয়েটারী ব্যঙ্গের প্রধান লক্ষ্য। সার্কাসেও যেতুম মাঝে মাঝে, সাহেব মেম সেজে পশুশালা, ইডেন গার্ডেন, বোটানিকেল গার্ডেনও দেখা হতো। কলকেতা বিস্বাদ একঘেয়ে লাগতে আরম্ভ করলে সপরিবারে খুলনা যাত্রার হিড়িক পড়তো। একবার বজরায় করে আমরা একমাসের মত বেরিয়ে পড়েছিলুম কালনার দিকে, কতদূর গিয়েছিলুম এখন আর মনে নেই। তবে গঙ্গার সে রজত ধবল কলনাদিনী স্রোতকণ্টকিত রূপ ভোলবার নয়। নদীতটের সেই গ্রাম্য ছবি—কুলবধূর পিতলের কলসী কাঁখে জলভরা, হাতের খাড়ু বাউটি নেড়ে বাসন মাজা, বজরা দেখে আড় ঘোমটার ফাঁকে কাজল-কালো চোখে বিস্ময় নিয়ে থমকে

চেয়ে থাকা, নৌকার সাদা পাল তুলে হাঁসের মত ভেসে চলা, বকের সারি, কাশের সাদা তুফান, শিকড় জাগা গাছের মূল ঘিরে নদীর তরঙ্গলীলা, কিই বা তার মাঝে ভুলতে পেরেছি! আমার গল্পে উপন্যাসে কবিতায় তারা ক্রমাগতই রূপ নিতে এসে ব্যর্থ হয়ে গেছে, কারণ আমার সে প্রতিভা কোথায় যে তাদের নিখুঁৎ করে ফুটিয়ে সরস জীবন্ত করে তুলতে পারি?



সাত

মানুষ গড়ে, দেবতা ভাঙে। আমরা আশার ছলনে ভুলে কতবারই যে কত জায়গায় কত রকমেই না আমাদের খেলাঘর সাজাচ্ছি, আমাদের এত সাধের সাজানো বাগান পাতছি আর ততবারই কে যেন অদৃশ্য তার হাত খানা বাড়িয়ে সব গুলিয়ে দিচ্ছে। স্ত্রী মরছে, কেঁদে কেটে 'ভগ্নহৃদয়' লিখে সুখের কাঙাল মানুষ আবার একটি রূপের ডালি ষোড়শী খুঁজে পেতে এনে, ভাঙা সংসার নতুন করে গুছিয়ে বসছে। সন্তানহারা মা চুল ছিঁড়ে বুক দু'দশ দিন চাপড়ে কেঁদে আবার উঠে বসছে; বাদ বাকি সন্তান ক'টিকে নিয়ে আবার হাসছে—আদর সোহাগে তাদের সান্ত্বনার আঁচলে ঘিরে নিয়ে। তাই কি এক চোখো বিধির সইছে?

হয়তো আমাদের ভাল সেই-ই বোঝে ভাল। ঝড় ঝাপটায় এই নিরন্তর বেড়ালছানা নাড়ানাড়িতেই হয়তো আমরা শক্ত সমর্থ হয়ে গড়ে উঠতে পারি। একটানা সুখের নীড়ের আওতায় গজানো আমাদের পলকা নধর জীবন হয়তো ষড় ঋতুর পরিবর্ত্তনে বেঁচে থাকতে পারে না। একঘেয়ে সুখের মাঝে এই নবরসঘন আনন্দের আস্বাদনও হয়তো বিস্বাদ হয়ে আসে। সৃষ্টির সুকুশলী শিল্পী কি যে চায় আমাদের জীবন ক'টি নিয়ে, সেই-ই তা' জানে। তার হিসাব কিতাব আমাদের প্রাণের ও আকুল হৃদয়ের চাওয়া পাওয়া সাধ আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে আজও কিছুতেই মিললো না। দু'বছর যেতে না যেতে আমাদের গোমস্ লেনের সুখের ঘরে আগুন লাগলো। এইখানে এসেও রাঙ্গা মায়ের কোলে বসে আমার প্রথম হাতে খড়ি, এক জন প্রাইভেট টিউটরের কাছে প্রথম ইংরাজী শিক্ষা। কাঠের মত কঠিন মুখ, কল্পনাশক্তি বিরহিত, নিতান্তই কাজের মানুষ বি এ পাশ এই মাষ্টার পুঙ্গবের হাতে আমি শিখেছিলুম যত না, নির্ম্মম কানমলা খেয়েছিলুম ততোধিক। রাঙ্গা মায়ের কড়া শাসনের ভয়ে তটস্থ এই প্রথম শিক্ষাগুরুটির আড়ে আবডালে দেওয়া ধমক ও কর্ণমলায় আমার লেখাপড়ার ওপর প্রথম বিতৃষ্ণা জন্মাল, পড়ার বইগুলোকে মনে হতে লাগল দাঁতবের-করা খেঁকী কুকুর—আমার যত দুঃখ দুর্দ্দশা ও অশান্তির ওরাই মূল। মুষড়ে পড়া নিরন্তর সন্ত্রস্ত মন নিয়ে পড়ার বই হাতে গেঙিয়ে চলা সে যে কি বিড়ম্বনা তা' আমাদের মাষ্টার ও বাপ

মা তাড়িত কত না সুকুমার চিত্ত বালক বোঝে! আমি যখন গ্যাঙাতুম মাষ্টার তখন চেয়ারে বসে ঢুলতেন, তারপর জেগে উঠে পড়া না পারার অপরাধে কাণ লাল করে চড় চাপড় মেরে আমায় বিদ্যা দান করে বিদায় হতেন। আমিও সে দিনকার মত ছুটি পেয়ে বাঁচতুম। গোমস্ লেনের জীবনে ষোলকলায় পূর্ণ আনন্দের চাঁদে এই লেখা পড়া শেখাটাই ছিল কলঙ্ক। প্রত্যেক শিশুচিত্ত স্বভাবতঃ যা' চায়, যে দিকে তার মনপ্রাণ সারা সত্তা সহজেই উন্মুখ হয় সেই দিককার জ্ঞান যদি তার কাছে ছেলেবেলা থেকে ধীরে ধীরে খেলাধূলা আনন্দের মধ্যে মেলে ধরা যায় তা' হলে জ্ঞানচর্চ্চাটা আর বিভীষিকা হয়ে দাঁড়ায় না। আমাদের জীবনে যখন শৈশব ও কৈশোরের উদ্বেল প্রাণ গতিহীন হয়ে এসেছে, সে স্বতঃস্ফূর্ত্ত উপচে-পড়া আনন্দ আর নেই, সংসারের স্বার্থবুদ্ধি দাঁড়িপাল্লা ধরে তার মুদিখানায় দু' পয়সার কেনা-বেচায় বসে গেছে; তখন আমরা হয়ে বসি গুরু মশাই। অহেতুক উচ্ছল আনন্দের মূর্ত্তি শিশুগুলির হিসাবকিতাব-হারা প্রাণকে সংসারী আমরা আমাদের স্বার্থবুদ্ধির পাঁচন বাড়ি নিয়ে তাড়া করে ঢোকাতে চাই আমাদের সঙ্কীর্ণ ভাল মন্দের গোয়ালে। অনেক ক্ষেত্রে এর ফলে কি যে নির্ম্মম অত্যাচারের সৃষ্টি হয় তা কোপন মা বাপের ঘরে বেদম শিশু ঠ্যাঙানী দেখেই বেশ বোঝা যায়। যারা শিশু, বালক ও যুবকের স্বভাব বোঝে না তাদের হাতে শিশুপালনের ও শিক্ষা-দীক্ষার ভার দেওয়া আর বদ্ধ উন্মাদকে সহজ মানুষের

সুখ শান্তির হর্ত্তা কর্ত্তা করা একই কথা। নিজের নিজের সঙ্কীর্ণ মত ও জিদের দিক দিয়ে আমরা সবাই একগুঁয়ে পাগল, হয় monomaniac নয় megalomaniac। মানুষের কোমল, জটিল ও সুকুমার মন-প্রাণ রূপ যন্ত্রটি নিয়ে যে নাড়াচাড়া করবার অধিকার পাবে তার দৃষ্টি হবে কতখানি বহুদিকদর্শী, সূক্ষ্ম ও অনুকম্পা এবং দরদে কোমল sensitive!

আমার জীবনের কথা বলতে বলতে প্রতি কথায় এই যে লেকচার দেবার ধারা—এই অবান্তর কথার পুনঃ পুনঃ অবতারণা, এটা গল্প-রসিক অনেক পাঠক পাঠিকার হয়তো ভাল লাগছে না। কিন্তু উপায়ান্তর নেই, আমার জীবন আমার চোখে একটি অতি চিত্তাকর্ষক চাণক্য নীতির বই; জীবনের প্রতিপদে প্রতি অলি গলির বাঁকে কত শিক্ষাই যে এ আমাকে দিয়েছে তার হিসাব কিতাব নেই, সে সব এড়িয়ে এ জীবন-কথা বলতে যাওয়া বিড়ম্বনা। নিছক গল্প-রসপিপাসুরা না হয় কমা সেমিকোলনের মত ছেদ বিরামের হিসাবে এগুলো বাদ দিয়েই পড়বেন।

এক দিন ভোর চারটে রাত্রে উঠে রাঙা মা আমার কাঁদতে লাগলেন, আমাকে বুকে জড়িয়ে ধরে বললেন, দেখো ধন, উনি বুঝি আর নেই, আমাদের ছেড়ে চলে গেছেন; আমার বুকের ভেতর যেন কেমন করছে। এখনি স্বপ্ন দেখছি যেন কাছে এসে গা ঠেলছেন আর বলছেন 'ওগো উঠে দেখো, আমি যাচ্ছি।' উঠে—দেখি সত্যিই জলজীয়ন্ত সামনে দাঁড়িয়ে

রয়েছেন, ধরতে গেলেই মিলিয়ে গেলেন।" সেই যে রাঙা মা কাঁদতে বসলেন বেলা দশটা অবধি তা' থামলো না।

আমি বাইরের ঘরে খেলা করছি। তখন বোধ হয় বেলা এগারটা কি বারটা। কয়েকজন সাহেব এসে বাড়ী ঢুকলেন, একজন আমার পরিচয় জিজ্ঞাসা করে বললেন, "তোমার মা কোথায় ?"

আ। ভেতরে আছেন।

সা। তোমার বাবা ডক্টর কে ডি ঘোষ ? খুলনার সিভিল সার্জ্জন ?

আ। হ্যাঁ।

সা। তাঁর সম্প্রতি কোন অসুখ হয়েছিল ?

আ। কৈ, না।

সা। তিনি মারা গেছেন, তোমার মাকে খবর দিতে পার ?

খবরটা শুনে আমার ভিতরে কোন দুঃখেরই সাড়া পেলুম না, শিশু ও বালকের চিত্ত তরল, স্নেহ ভালবাসাও নিম্নগামী, সচরাচর বড়র দিক থেকে ছোটর দিকে নামে। আমি মাকে খবর দিতে নারাজ হওয়ায় সাহেব ক'জন মুখ চাওয়া চাওয়ি করতে লাগলেন। ইনি বলেন, 'তুমি বল', উনি বলেন, 'না বাপু তুমি বল, আমি পারবো না।' শেষটা আমাকে দিয়ে মাকে ডাকিয়ে একজন জিজ্ঞেস করলেন, 'আপনার স্বামী ডক্টর কে ডি ঘোষ ?' মা পরদার আড়ালে দাঁড়িয়ে থর থর করে

কাঁপছিলেন, এই কথায়ই কেঁদে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁর গভীর প্রেম প্রেমাস্পদের চিরবিরহের সংবাদ আগেই পেয়েছিল, আর বাবার এতবড় ভালবাসার এই জীবন-সঙ্গিনীকে আমার ব্রাহ্ম আত্মীয়রা ঠাউরেছিলেন বাজারের বেশ্যা। মানুষের পেঁচার মত দিককাণা বুদ্ধি আর ধর্ম্মজ্ঞান কতদূর হীন হতে পারে তার দৃষ্টান্ত বাবার মৃত্যুতে আমি সাধারণ সমাজের লোকের শীর্ষ স্থানীয় নেতাদের মধ্যে পেয়েছি। তা যথাস্থানে যৎকিঞ্চিৎ বলবো।

সাহেবরা কোন গতিকে নির্ম্মম কাজটা সেরে চলে গেলেন, নির্ব্বান্ধব এই জনবহুল নগরের মাঝে অসহায় মা আমার আমাদের বুকে নিয়ে কাঁদতে লাগলেন। যত বড়ই শোক হোক মানুষ সন্তানের স্নেহে তা সামলে নেয়,নিরাভরণ শুভ্র বৈধব্য বেশে শোকশয্যা থেকে উঠে মা বাবার বন্ধু ব্যারিষ্টার মনোমোহন ঘোষের সঙ্গে নিজে গিয়ে দেখা করলেন। এতদিন পর সংবাদ পেয়ে কাকা এলেন, দেওঘরবাসী আমার মাতামহের প্রতিনিধি হয়ে ন-মেশো শ্রীযুক্ত কৃষ্ণকুমার মিত্র মশাই এলেন, বাগবাজারের পিসীরা এলেন, আত্মীয় স্বজনরা সব একে একে দেখা দিতে লাগলেন। বাবার জীবিতকালে কাকাদের,দেওঘরবাসী মাতামহদের ও ন-মেশোমশাইদের কারু সঙ্গেই আমাদের সম্পর্ক ছিল না। ছিল কেবল বাবার দিকের দু'চারটি মানুষের সঙ্গে। আমার বড় পিসী বিধবা বিরাজমোহিনী আসতেন আমাদের গোমস লেনের বাড়ীতে, আমার পিসতুত বোন গোলাপ দিদি

বাবার খুব প্রিয়পাত্রী ছিলেন। তিনি তখন দুই তিন ছেলের মা, বাবা দেখেছি তাঁকেও কোলে করে ছোট মেয়েটির মত আদর করতেন। আন্দামান থেকে ফিরেও এ শ্যামবর্ণ শান্ত প্রকৃতি গোলাপ দিদির সঙ্গে আমি দেখা করেছি, তাঁর মুখে ছিল একটি অনুপম শ্রী, সুন্দরী না হ'লেও যা' মানুষকে মুগ্ধ করতো।

রাঙা মা আমাদের নিয়ে পিসীর বাড়ী যেতেন, তাঁরাও মাঝে মাঝে তত্ত্ব তালাস নিতেন, আসতেন-যেতেন। একবার বাবা দিনকতকের জন্যে দেশভ্রমণে যান—কাশী, এলাহাবাদ, জব্বলপুর ইত্যাদি। ছেলেপুলেদের বাবা জিজ্ঞেস করলেন "কে আমার সঙ্গে যাবে বল?" আমি তখনই রাজী হই, শেষটা বাবা, একজন চাকর ও আমি যাত্রা করলুম। সে ভ্রমণের কথা অতি ক্ষীণ অস্পষ্ট ছবির মত আমার মনে আছে। রাঙা মা আমায় কতকগুলি গান শিখিয়েছিলেন, তার মধ্যে কৃষ্ণ বিষয়ে এই গানটী গেয়ে কাশীতে আমার অতি বৃদ্ধা ঠাকুরমাকে কাঁদিয়ে দিয়েছিলুম বলে আমার মনে আছে,

"আর তো ব্রজে যাব না রে ভাই,
যেতে প্রাণ নাহি চায়;
ব্রজের খেলা ফুরিয়ে গেছে,
তাই এসেছি মথুরায়।
মা ছেড়েছি, বাপ ছেড়েছি,
ব্রজের খেলা ভুলে গেছি,

তোমরা সবাই মা বলে ভাই,

ভুলিয়ে রেখো মা যশোদায় ."

ঠাকুর মা তখন উঠতে পারেন না, চোখের দৃষ্টিও তাঁর গেছে, বড় পিসী তাঁর সেবা করেন। বাবার মুখে মাথায় হাত বুলিয়ে কোলের কাছে টেনে নিয়ে ঠাকুরমা তাঁকে কোলের শিশুর মত আদর করতেন, আমায় চোখে দেখতে পেতেন না বলে তাঁর কি দুঃখ! জব্বলপুরের মার্ব্বল পাহাড় ও জলপ্রপাত আমার এখনও মনে আছে, এলাহাবাদে একটা কি মেলায় বাজী পুড়ছিল, আতস বাজী দিয়ে রাম লক্ষণ হনুমান রাবণ সব করা হয়েছিল। একটা বিপুল মাঠে অনন্ত জনসমুদ্র আমার আজও মনে বিস্মৃতির মাঝে ডুবে যায়নি। আর মনে আছে ইংরাজি হোটেলে এক এক প্লেট ভরে কাটলেট খাওয়া। সেই হোটেলে সাহেবী কেতায় আমরা আশ্রয় নিয়েছিলুম। বাবা চলে যেতেন কাজে কর্ম্মে আমাকে চাকরদের কাছে রেখে—যা' চাই তাই দেবার হুকুম জারি ক'রে। আমি আর চাকরটি পরামর্শ করে এক একবারে এক এক ডজন কাটলেট অর্ডার দিতুম, বলাই বাহুল্য তার অনেকগুলো যেতো লোভী চাকরটির উদর নামক গহ্বরে।

বাবার মৃত্যুর পর কাকা একদিন কি দুদিন এসেছিলেন, তারপর আমাদের আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিয়ে তিনি ভাগলপুর চলে যান। শ্রীকৃষ্ণকুমার মিত্র প্রায়ই আসতেন, একদিন তাঁর বড় মেয়ে কুমারী রত্ন বা কুমুদিনীকে এনেছিলেন। আমাদের মাসতুত বোনেদের মধ্যে সেই ছিল সব চেয়ে সুন্দরী। সেই

যে আমার তার ওপর টান হ'লো সে ভালবাসা আজও আমি কাটিয়ে উঠতে পারি নি, যদিও আমাদের দেখা সাক্ষাৎ ক্বচিৎ কখনও হয়। আমার তখন জগতের স্বার্থবুদ্ধি খুব ভাল রকম হয় নি, তবু বৈষয়িক কাণ্ড নিয়ে যে সব ব্যাপার আমাদের চার পাশে ঘটছিল তা' আমি কতক কতক বুঝতুম। বাবার উইল মনোমোহন ঘোষের বাড়ীতে পড়া হ'লো, তাতে তিনি আমার গর্ভধারিণী মা স্বর্ণলতার ব্যবস্থা করে সমস্ত টাকা ও বিষয়-আশয় এবং ছেলে মেয়ের ভার রাঙা মায়ের হাতে দিয়ে যান। এই নিয়ে আমার নীতিবাগীশ আত্মীয়দের সঙ্গে মায়ের বাধলো লড়াই। এক দিকে অসহায় অর্দ্ধশিক্ষিত আইনের প্যাচে ক' অক্ষর গোমাংস হিন্দু বিধবা আর একদিকে সমাজের ও পরিবারের গুরুগম্ভীর বিদ্বান নীতিচঞ্চু অভিভাবকের দল। এরকম ক্ষেত্রে কোন্ পক্ষের পরাজয় অবশ্যম্ভাবী তা সহজেই অনুমেয়।





আট

আমাদের উচ্চ-চিন্তা, আদর্শ বা নীতিবাগীশতা এ সবই পোষাকী বস্ত্র, সমাজে বাহির হবার সময় নিজেকে লোক চক্ষে জাহির করবার বা তুলে ধরবার সময় এগুলি আমরা পরে দাঁড়াই। জীবনের ঘরোয়া কাজে—প্রাণের ভোগের আট-পৌরে ব্যাপারে কিন্তু এ সাজ-পোষাক খসে পড়ে বাসনা-কামনার ঘূর্ণিপাকে, তখন কোন ছদ্মবেশই আর রাখা চলে না, পশু-স্তরের ক্ষুধার্ত্ত জীবটি তার কদাকার অঙ্গ নিয়ে পুরো নগ্ন বীভৎসতায় বেরিয়ে পড়ে। আজ আমার এই পঞ্চাশ বছর বয়সে এই ঘটনা আমি কত না ক্ষেত্রেই কতবার দেখেছি। মুখে আমরা সতী, জনসমাজে লজ্জাশীলা দীঘল-ঘোমটা নারী—সতীর ও ভদ্রতার জলজলে বিজ্ঞাপন। খুব বড় ধর্ম্মপ্রাণ নীতিবাগীশকে দেখে হয়তো ভেবেছি, এ মানুষের বুঝি কখনও

পদস্খলন হবে না। ও হরি হরি! একটু পরদা তুলে তার জীবনের অন্তঃপুরে তাকে দেখে অবাক্! তার নিজের বা মেয়ের কেলেঙ্কারী চাপা দেবার জন্যে সেই সাধু পুরুষের কি আকুলি ব্যাকুলি, কি ছেলেমানুষের মত ব্যবহার! এরকমটা কেন হয়? আমার লেখায় নানা জায়গায় মনুষ্য-চরিত বিশ্লেষণ করতে গিয়ে এর হেতু আমি বিশদ করে অনেকবারই বলেছি। মানুষের মন ঊর্দ্ধ-লোকের জীব—সে হচ্ছে আধ আঁধার আধ আলোকের রাজ্যের বাসিন্দা—এক কথায় সাজা ভদ্রলোক বা জেণ্টলম্যান; কিন্তু মানুষের প্রাণ হচ্ছে কাদার জন্তু, পাঁকে তার বাস এবং পাঁক তার আহার্য্য! এই মন আর প্রাণ দুইয়ে মিলে জুলে ঘরকন্না, তাই মনের আকাশ-কুসুম মনেই ফুটে চিন্তায়ই মিলিয়ে যায়; জীবনে রূপ নিতে পারে না; সেখানে পাঁকের কুমীর প্রাণই হচ্ছে রাজা, কদাকার তার লেজের ঘায়ে ঘায়ে কাদা ঘুলিয়ে অহরহ সে শিকার ধরছেই সেখানে, নির্ম্মল জীবন-জল নিত্যই রক্তে রাঙিয়ে উঠছে।

বাবা মারা যাবার পর যখন কৌন্সুলী মনোমোহন ঘোষের বাড়ীতে উইল পড়া হয়ে রাঙা মা হলেন বিষয়-আশয়ের সর্ব্বময়ী কর্ত্রী, তখন এই ব্যাপারটাকে রদ করবার জন্যে আমার ব্রাহ্ম আত্মীয়দের মধ্যে পড়ে গেল একটা আপ্রাণ চেষ্টা। যেমন নগ্ন তেমনি বীভৎস! কি করে এই অপাঙক্তেয় স্ত্রীলোকটিকে ধোপদস্ত সামাজিক আত্মীয় মহলে চালানো যায়! ছেলে মেয়ে ওর হাতে থাকলে যে উচ্ছন্নে যাবে! এই সব দুশ্চিন্তায় পরম

পিতার সন্তানদের যখন প্রায় আহার নিদ্রা ত্যাগ হবার দাখিল হয়েছে তখন আমার একজন আত্মীয় (সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের একজন চূড়া) এসে মায়ের সঙ্গে কথায় বার্ত্তায় উইলখানি একবার দেখতে চাইলেন। সরল মেয়ে মা আমার উইলখানা তাঁর হাতে এনে দেবামাত্র তিনি পকেটস্থ করে বললেন, "তুমি ছেলে মেয়ে পাবে না আর টাকা কড়ির দাবী যদি কর এই উইল জাল ও তোমাকে বাজারের বেশ্যা বলে কোর্টে প্রমাণ করা হবে।" এই বলে ধর্ম্মপ্রাণ মানুষটি দিব্য গজেন্দ্র গমনে প্রস্থান করলেন।

মা আমার তো কেঁদেই আকুল। অনেক কান্নাকাটি ধমক চমকের পর একটা সালিসী হয়ে স্থির হ'লো উইল মত কাজ হতে পারে যদি মা রীতিমত দীক্ষা নিয়ে ব্রাহ্ম হন। ছেলে মেয়ে হারাবার ভয়ে আকুল মা প্রথমটা রাজী হলেন, হিন্দুধর্ম্মের আচার-নিষ্ঠায় নিষ্ঠাবতী তার তখন উভয় সঙ্কট উপস্থিত, বাপ পিতামহের ধর্ম্ম ছাড়াও কষ্টকর আবার ছেলে হারানোও তাঁর পক্ষে একটা নিদারুণ দুর্ব্বিষহ ব্যাপার। একদিন ব্রাহ্মসমাজে আচার্য্য আদি সব সেজে গুজে পুলকিত প্রাণে সমবেত হয়েছেন —সেই দিনই রাঙা মায়ের ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হবার দিন। মা কিন্তু যথা সময়ে হুজুরে হাজির হলেন না, ধর্ম্ম ত্যাগ করা থেকে মন তাঁর শেষ মুহূর্ত্তে বেঁকে বসলো। ব্রাহ্ম আত্মীয়টি রুদ্র মূর্ত্তিতে এসে অনেক ধমক চমক করলেন, শেষে ব্যাপারটা কোর্টে যায় যায়। কিন্তু খোলা আদালতে স্বামীর নামে একটা কেলেঙ্কারী করাও পতিপ্রাণা হিন্দু মেয়ের পক্ষে কতদূর কঠিন

তা সহজেই বোঝা যায়। বাবার এই দ্বিতীয় বিবাহ বিবাহই নয়, আইনের চোখে এক্ট তিন অনুযায়ী প্রথম বিবাহের পর এ বিবাহ বেআইনী অপরাধ। তাঁদের দুজনের ছিল প্রেমের মিলন, অন্তরের বিবাহ—'যদিদং হৃদয়ং মম তদিদং হৃদয়ং তব' —এই শাস্ত্রবাক্যের অনুসরণে দু'জনের হয়েছিল সহজ স্বাভাবিক হৃদয়-বিনিময়। কিন্তু ধর্মপ্রাণ কি হিন্দু আর কি ব্রাহ্ম সমাজে হৃদয়ের স্বতঃস্ফূর্ত্ত মিলন তো বিবাহের পক্ষে একটা অবান্তর ব্যাপার, আসল হচ্ছে প্রাণহীন অনুষ্ঠানগুলো। আদালতের বিজ্ঞ জজদের চোখেও তাই, তাঁরা দেখবেন আইন, আর দেখবেন কেতাব মাফিক সম্প্রদান হয়েছিল কিনা, বাপ মা গুরুজন দাঁড়িয়ে মন্ত্র পড়ে এই জবাই কার্য্যটি সমাধান করেছিলেন কিনা।

অনেক বাক বিতণ্ডা ঘোরাঘুরির পর রফা হল রাঙা মা খোর পোষ বাবদ পাঁচ হাজার টাকা মাত্র পাবেন, ছেলে মেয়ে থাকবে মাতুলালয়ে দেওঘরে, তিন চার মাস অন্তর তিনি তাদের দেখতে পাবেন। ঠিক কি সর্ত্তটা এসম্বন্ধে হয়েছিল তা' আমার আজ আর মনে নেই কিন্তু তিনি যে ছেলে মেয়েকে প্রায়ই কাছে পাবেন এটা তার মধ্যে ছিল, কতদিন পরে পরে সেটা আমি ভুলে গেছি। একটা দিন স্থির হলো আমাদের ছাড়াছাড়ির, মা আকুল কান্না বুকে চেপে সেই ভীষণ দিনের প্রতীক্ষায় রইলেন। সামনে যদি মৃত্যুদণ্ড আসন্ন হ'য়ে থাকে তা' হলে পরমায়ুর গোণা দিনগুলি হুহু করে চলে যায়। সে কয় দিনের করুণ ব্যাপার

আর আমি বর্ণনা করবো না। একদিন আমাকে ও দিদিকে নিয়ে গাড়ী করে মা চললেন সেই আত্মীয়টির বাড়ীতে, জীবন্ত দু'টি তাঁর প্রাণপুত্তলীকে বিসর্জ্জন দিতে—এই বৃথা আশা বুকে পুষে যে তবু যা হোক মাঝে মাঝে তাদের দেখে চোখ জুড়াতে পাবেন। সেখানে বাড়ীর দরজায় পৌঁছে মা আর নামলেন না, দিদিকে প্রথমে নামিয়ে নেওয়া হ'লো। আমি কিছুতেই রাঙা মাকে ছাড়বো না, তাঁকে আঁকড়ে ধরে কান্না জুড়ে দিলুম। সেই আত্মীয়টি তখন টেনে হিঁচড়ে আমায় সেই অপবিত্র কোল থেকে তাঁর পবিত্র সংসারে ছিনিয়ে নিলেন। মা মুখ চেপে চোখ বুজে অর্দ্ধ অজ্ঞান অবস্থায় গাড়ীতে পড়ে রইলেন, তাঁকে নিয়ে গাড়ী শূন্য-পুরী গোমস্ লেনে ফিরে গেল। এইভাবে সীতা হরণ করে আমায় দু' দু'বার ছিনিয়ে নিতে হয়েছে, একবার পাগল মায়ের কাছ থেকে আর একবার এই রাঙা মায়ের কাছ থেকে। আরও একবার রাজশক্তি আমাকে সীতা হরণ করে নিয়ে প্রথমে ঘাতকের Death cell-এ এবং তার পর আন্দামানের অশোক বনে রেখেছিলেন! না জানি এখনও দগ্ধ অদৃষ্টে আরও কি আছে; তবে আশা এই যে ৫০-এর কোটা পেরিয়েছি, এখন 'বনং ব্রজেৎ'-এর পালা বলে যদি রেহাই পাই, আর অদৃষ্টে যত কিছু হতে পারে সে দশ দশাই তো ইতিমধ্যেই হয়ে চুকেছে। বৃদ্ধ বয়সে এখন দারিদ্র্য-দুঃখও এসেছে, এখন—ভোজনং যত্র তত্র শয়নং হট্টমন্দিরে, বাকি শুধু মরণং গোমতী তীরে; সুতরাং অপরস্মা কিং ভবিষ্যতি?

আত্মীয়টি আমার গুরু গম্ভীর প্রকৃতির মানুষ, অবাস্তব হাসি তাঁর শ্মশ্রুল মুখে কদাচিৎ উদয় হতো, বাজে কথা তিনি প্রাণান্তে বলতেন না। যেখানে তিনি বসতেন তার চারি ধারে বিশ হাত বেড়ে জায়গাটা গাম্ভীর্য্যে থম থম করতো, সেখানকার মানুষরা মনের ও প্রাণের গুমোটে দম আটকে পেট ফুলে মারা যাবার দাখিল হতো। তাঁর স্ত্রী ছিলেন জীর্ণা শীর্ণা রুক্ষ মেজাজের মানুষ, বাঁকা দৃষ্টি তাঁর খুঁজতো মানুষের ছিদ্র, অতি মাত্রায় মরাল মন তাঁর হিন্দু সমাজের সব কিছুকে দেখতো অসহিষ্ণু ঘৃণায়। পৌত্তলিক মানুষ ছিল এঁদের চোখে নিতান্ত কৃপার পাত্র, অন্ধকার থেকে আলোকে আনবার অভিশপ্ত আত্মা। এ বাড়ীর দুই মেয়ে ও এক ছেলে তখন নিতান্ত ছেলে মানুষ, তারাই ছিল আমাদের একমাত্র আনন্দের সাথী, তখনও দুনিয়ার ভাল মন্দের হিসাব-বুদ্ধি তাদের সরলতা নষ্ট করে নি। সে রাত্রে শুতে যাওয়া অবধি আমি অবিরাম কেঁদেছিলুম, রাঙা মাকে ছেড়ে আসবার ব্যথা আমার সারতে দশ পনর দিন লেগেছিল। তারপর পূজোর ছুটিতে আমরা গেলুম বৈদ্যনাথে—আমার মাতুলালয়ে, দিদিমা নিস্তারিণী দেবীর সংসারে দাদাবাবু ঋষি রাজ নারায়ণ তখন বেঁচে; বড় মামা, ছোট মামা, পাগল মেজ মামা, মা ও মাসী সবাই আছেন; মা রোহিণীতে আর বাদ বাকি সবাই পুরন্দাহার বাড়ীতে।

বৈদ্যনাথ আমার শৈশবের কৈশোরের ও প্রথম যৌবনের সুখ

দুঃখের স্মৃতিতে জড়ানো স্বপ্নপুরী বৈদ্যনাথ। সে যে চেতনার কতখানি জুড়ে আজও জেগে আছে তা বলে বোঝান শক্ত। পূবে নীল আকাশের গায়ে গাঢ়তর সুনীল রেখায় তিনটী চূড়ায় আঁকা ত্রিকূট পাহাড়, পশ্চিমে ডুবন্ত সূর্য্যের রাঙা আভা গায়ে কুব্জপৃষ্ঠ কচ্ছপের মত প্রকাণ্ড দিগড়িয়া, রাঙা মাটির ঢেউ খেলানো মাঠের মাঝে সবুজ ধান ক্ষেতের কোলে ক্ষীণ রজত রেখায় আঁকা বাঁকা দাড়োয়া নদী। উত্তর-পশ্চিম কোণে নন্দন পাহাড়ের মাথায় ভাঙা মন্দিরের গাছ গজানো দেওয়াল। চার দিকে কত শোভা, কত বনের ঘন রেখা, ধানের সবুজ আঁচল, মুক্ত দিকচক্রবাল, খোলা মাঠের ঝিরঝিরে হাওয়া, উদাস সন্ধ্যা, স্নিগ্ধ উষা, কাক জ্যোৎস্না ঢালা কত না সুখ নিশি! সে বৈদ্যনাথ কি আমার ভোলবার জিনিস?

এই বৈদ্যনাথে ১৮৯৩ সাল থেকে আমার জীবনে পাচটি বছর কেটেছে। এই কয়টি বছরের সব ঘটনা খুঁটিয়ে লিখতে গেলে একটি অর্দ্ধেক মহাভারতের নয় পর্ব্বের অবতারণা হতে পারে। কৈশোর কাটিয়ে যৌবনে পড়বার পথে এইখানে স্কুল জীবনে আমার মন প্রাণের খুব দ্রুত বিকাশ হয়েছিল। তারই গল্প এবারে বলবো। মামার বাড়ীটি ঠিক ডাক বাঙালার পাশে, পূবে ও পশ্চিমে তার উধাও সুদূর ঢেউ খেলানো মাঠ; উত্তরে মিস এ্ড্রামসের মিশন-বাড়ী। এই মিস এডামস্ অতি ভক্তিমতী ও নিষ্ঠাবতী খৃশ্চান ছিলেন, তিনি অতি অকপটে ঐকান্তিকতায় বিশ্বাস করতেন প্রেমাবতার যীশুকে যে না ভজেছে তার অনন্ত

নরক। আমি যখন তাঁকে দেখি তখন তিনি অতি বৃদ্ধা, একটি কাঠের গাড়ীতে তিনি বাস করতেন, ঘরের মত পরিসর সেই গাড়ীর মধ্যে ছিল তাঁর শোবার ঘর, রন্ধনশালা, লাইব্রেরী সবই। তাঁরই হাতে দীক্ষিত সাঁওতাল খৃশ্চান একজন তাঁকে ঐ গাড়ীতে করে টেনে নিয়ে বেড়াত; প্রকাণ্ড বাড়ী ও গির্জ্জার কাছে গাড়ীখানি সচরাচর দাঁড়িয়ে থাকতো। তিনি আমার দাদাবাবু রাজনারায়ণ বসুকে খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত করবার জন্যে আট দশ বছর চেষ্টা করেছিলেন, যখনই আসতেন তাঁকে ধর্ম্মোপদেশ দিতেন এবং যীশু প্রেম থেকে তাঁর বঞ্চিত দশা মনে করে সত্যি সত্যি ইনি অঝোরে কাঁদতেন। প্রায় ৭৫ কিম্বা ৮০ বছর অবধি তিনি বেঁচে ছিলেন; কোন এক সাঁওতালের কাছ থেকে কুষ্ঠ রোগের অদ্ভুত ওষুধ পেয়েছিলেন, খৃশ্চান হবার প্রতিশ্রুতি পেলেই রোগীকে নিজের নন্দন পাহাড়ের কাছে কুষ্ঠাশ্রমে রেখে সারিয়ে দিতেন, তারাও তখন তাঁর গাড়ীখানি দূর থেকে আসছে দেখে নিজেদের গ্রামের দিকে সরে পড়তো, কারণ রোগ তখন সেরে গেছে, আর বৃথা খৃশ্চান হয়ে কি লাভ। বার বার ঠকেও আবার তিনি নতুন নতুন মানুষকে ঐ সর্ত্তে ওষুধ দিতেন, 'খৃশ্চান হবো' বলে তাঁর কাছে না পাওয়া যেত এমন দুর্লভ বস্তু কিছুই ছিল না।

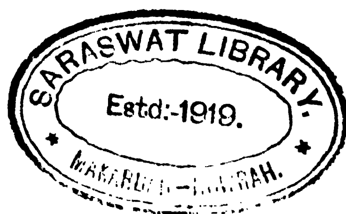
দেওঘরে এসে রাঙা মায়ের সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ হলো, কলকেতায় যে এক মাস ছিলুম সেখানেও দেখা হয় নি।

মানুষের মন প্রাণ হচ্ছে আনন্দের পোকা, শোক দুঃখ তার প্রকৃতির ব্যতিক্রম, তাই শোকের বা দুঃখের পুঁটলি আঁকড়ে সে বেশীদিন থাকতে পারে না। দিন গেলে সে আবার হাসে, আবার ঘরকন্না পাতে, আবার নতুন নতুন মানুষকে হৃদয় প্রাণ নতুন করে দিয়ে ফেলে। আনন্দ হাসি সুখ শান্তিই মানুষের রসঘন সত্তার আসল খোরাক; দুঃখ তার প্রকৃতির এতই বিরোধী যে বেশী দিন শোক দুঃখকে ধরে থাকলে তার মন স্বাভাবিক গতি হারিয়ে পাগল হয়ে যায়, দেহ ভেঙ্গে পড়ে। আমাদের সত্তার আঁধার পুরীতে কিন্তু (sub-conscious) এমন বিকৃতি আছে এবং এমন morbid দিকও আছে যার মাঝে রয়েছে শোক দুঃখ ও বিপদ আপদের আগুনের দিকে টান। মা যখন বহু আগে মরা ছেলের জন্যে নিজ কাজকর্ম্মের অবসরে পা ছড়িয়ে বসে ইনিয়ে বিনিয়ে কাঁদে তখন তার এই বিকৃত morbid মন সেই দুঃখের ঝাল আচারটুকু জীবে রেখে নেড়ে নেড়ে চাখে, ভোগ করে। 'আমি বড় দুঃখী গো, আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে গো' এই কথা দশ জনকে ডেকে বলায় সুখ আছে, আগুনের প্রতি পতঙ্গের টানের মত মরণ বা অকল্যাণের দিকেও মানুষের একটা লোভ ও টান আছে। মৃত্যুর দুয়ারের কাছাকাছি ঘুরে বেড়াবার নেশায়ই শিকারী বাঘের গুহায় যায়, যোদ্ধা যুদ্ধ করে, পরোপকারী বিপন্নকে উদ্ধার করতে আগুনে ঝাঁপ দেয়। কিন্তু শোকের আঁধার ছায়া মানুষের সহজ আনন্দঘন রসস্বরূপ যে সত্তা তার বিরোধী।

মায়ের কাছ ছাড়া হবার দুঃখও আমাকে বেশি দিন বেঁধে নি। রাঙা মা আমাকে অতখানি আত্ম-বিস্মৃত হয়ে ভাল বাসতেন বলেই বোধ হয় একটা ভাসা ভাসা টান তাঁর ওপর আমারও হয়েছিল, কারণ ভালবাসায় আত্মতৃপ্তি আছে, সুখ আছে, পরম আরাম আছে। মানুষের আত্মম্ভরিতা ওতে সুখ পায়। শেষের জীবনে দেখেছি মায়ের প্রতি ভালবাসা আমার আদৌ গভীর নয়, একটা কর্ত্তব্য বুদ্ধি আমাকে তাঁর দিকে সজাগ রাখতো মাত্র। একবার খুব পীড়িত হয়ে পড়ে তাঁর শেষ দিন এসেছে ভেবে বাবা আমাকে তাঁর মৃত্যু শিয়রে ডেকে বললেন, "দেখো, আমি মলে সবাই তোমার মাকে ত্যাগ করবে, তুমি কিন্তু ওকে ত্যাগ করো না, আমাকে কথা দাও।" তাঁর মাথা ছুঁয়ে আমি কথা দিয়েছিলুম। দেওঘরে এসে বড় মামা যোগীন্দ্রনাথ বসুকে ও মাতামহ রাজনারায়ণ বাবুকে আমার অভিভাবক রূপে পেয়ে আমি বেঁচে গেলুম। কারণ এঁরা দুজনেই আমুদে রসিক লোক, আমার এঁরা হলেন বন্ধু, অভিভাবক—সে কেবল নামে মাত্র।

দেওঘরের বাড়ী এখনও জরাজীর্ণ অবস্থায় দাঁড়িয়ে আছে, আর কিছুদিনের মধ্যেই হয়তো ভেঙে পড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। সে যুগে ঋষি রাজনারায়ণ একটি কম মানুষ ছিলেন না, তাঁর "হিন্দু ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" নামে বক্তৃতায় বাঙলা দেশের মনের ধারা ফিরে গিয়েছিল, ইংরাজি শিক্ষিতদের সাহেবী ধরণ ধারণের লোভ আর খৃশ্চান হবার হিড়িক থেমে গেছিল যে কজন দেশ-

নেতা ও সুলেখকের কলমের জোরে, রাজনারায়ণ বসু তাঁদের একজন। এ জাতি যে বাঁচবে, নিজের অপূর্ব্ব সাহিত্য কলা ও স্বতন্ত্র জীবন গড়ে তুলবে তার আয়োজনের জন্যে শঙ্খ হাতে জাতির প্রাণগঙ্গার অবতরণ ঘটাবার সামর্থ্য নিয়ে কত ভগীরথ তুল্য মানুষই না এসেছিলেন। দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, কেশবচন্দ্র, বঙ্কিম, ভূদেবচন্দ্র, বিদ্যাসাগর, শ্রীরামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ—সবাই এসে বাঙালীর জীবনতরীর হাল ও দাঁড় ধরেছিলেন একে একে অর্দ্ধ শতাব্দী জুড়ে। এমন মানুষের বাড়ীখানি আজ দেনার দায়ে বিকিয়ে যাচ্ছে, দেশের ধনীদের পক্ষে এ কম লজ্জার কথা নয়। কিন্তু বলা বৃথা—দেশ আমাদের এমনই। নিজের সুসন্তানকে এ অকৃতজ্ঞ দেশ চেনে না।


SARASWAT LIBRARY
Estd:-1919.



নয়

তখন মাইকেল মধুসূদন দত্তের জীবনী প্রণেতা শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ বসু দেওঘর হাই ইংলিশ স্কুলের হেড মাষ্টার। আমার বড় মামার নামও ছিল যোগীন্দ্র নাথ বসু এবং দু'জনে ছিলেন অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু। প্রসিদ্ধ "দেশের কথা" (আমাদের বোমার যুগে এই বইখানি বে-আইনী ঘোষণা করা হয়) প্রণেতা সখারাম গণেশ দেউস্কর এই স্কুলে নীচের ক্লাসে অধ্যাপনা করতেন। নীচের ক্লাসের শিক্ষক হ'লে হবে কি, তাঁর ও হেডমাষ্টার মশাইয়ের মত ছেলেদের জনপ্রিয় শিক্ষক এমন কেউ আর দেওঘরে তখন ছিল না। শিক্ষকদের মধ্যে আর যাদের কথা মনে আছে তার মধ্যে পণ্ডিত মশাই, পাণ্ডা শিক্ষক ঝা-মশাই আর তৃতীয় শিক্ষক বকুলাল বাবুর কথাই আমার মনে পড়ে।

আমার আত্মকথা

আমায় প্রথম যে দিন বড় মামা সঙ্গে করে নিয়ে গেলেন স্কুলে ভর্তি করার জন্যে সে দিন আমার বুকের মাঝে ভয়ের কি গুরুগুরু—যেন বলিদানের জন্যে পাঁঠাকে পরম করুণাময়ী মা কালীর কাছে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। স্কুল কি তা' সে পর্য্যন্ত কখনও চোখে দেখা হয় নি, ভয়াবহ রকম গম্ভীর উদ্যতবেত্র মাষ্টারের দল, চারিদিকে অচেনা মুখ এবং পড়ার অপ্রীতিকর পিঠ-মাজা-ভাঙ্গা চাপ এই সবগুলো নিয়ে একটা ভীতিপ্রদ ধারণা শুনে শুনে মনের অন্ধকারে ব্রহ্মদৈত্যের মত জমা হয়েছিল। প্রথমে অফিসে হেড মাষ্টার মশাইকে দেখলুম—বেঁটে ক্ষীণকায় গৌরকান্তি শান্ত ও গম্ভীর মানুষটি, হাসেনও বেশ আবার সে হাসিখুসীর মাঝে গাম্ভীর্য্য এবং ওজনও রাখতে জানেন। আমাকে দু'চারটি প্রশ্ন করে পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি করে নিলেন এবং সঙ্গে করে নিয়ে গিয়ে ত্রিশ পঁয়ত্রিশ জন অজানা ছেলের মাঝে বসিয়ে দিয়ে এলেন। তখন বোধ হয় পণ্ডিত মশাইএর ক্লাস; পোড়া বৃষকাষ্ঠের মত কালো শীর্ণ পুরুষ, রক্তচক্ষু, গোঁফ ও ছাগল দাড়ি আছে, সদাই নিদ্রালু এবং রুক্ষভাষী। এই ছিলেন পণ্ডিত মশাই। তিনি পড়া জিজ্ঞেস করছেন উপক্রমণিকা ব্যাকরণের আর মুহুর্মুহু বিদ্রূপবাণ ও তিরস্কারের মধ্যে ছেলেরা বেঞ্চিতে আসন বদল করে উন্নতি অধোগতির নাগরদোলায় দুলছে। সেই যে পণ্ডিতমশাইকে বিষ চোখে দেখলুম আর কখনও সে স্মৃতির দাগ মন প্রাণ থেকে মোছে নি। নিজের রকমে তিনি স্নেহপ্রবণও যে না ছিলেন তা' নয় কিন্তু তাঁর

বেতহাতে বিদ্রূপ-পরায়ণ রুক্ষভাষী দিকটা নীচের ক্লাসের ছেলের কাছে তাঁকে ভয়ের সামগ্রী ও উঁচু ক্লাসের ছেলেদের কাছে ঠাট্টার বস্তু করে রেখেছিল। ছেলেদের মন প্রাণগুলি এত কোমল, এত স্পর্শালু, এত শীঘ্র দাগ নেয় যে, তাদের হৃদয়জয় এক দিক যেমন খুব সহজ, আর এক দিয়ে তেমনি শক্ত ব্যাপার।

আমাদেরই দেওঘর স্কুলের পঞ্চম মাষ্টার কীর্ত্তিচন্দ্র দত্ত ঝা-মশাই ছিলেন জাতিতে পাণ্ডা ব্রাহ্মণ, দেওঘরের পাণ্ডাদের মধ্যে বি এ পাশ মানুষ তখন ছিল প্রায় আকাশ কুসুমের মত দুর্ল্লভ পদার্থ। মোটা থলথলে কালো ভুঁড়েল মানুষটি মুহুর্মুহু পানতামাক সেবার ফলে কালো ময়লা দাঁত বার করে যখন হাসতেন আর স্থূল রসিকতা করতেন তখন সমস্ত ক্লাস হেসে কুটিপাটি হ'তো। তাঁর কয়েকটি বাঁধা রসিকতা ছিল যা শুনে শুনে আমাদের কর্ণ হয়ে গিয়েছিল অভ্যস্ত; সেই সব রসিকতা তাঁকে বলিয়ে প্রসন্ন করবার ও তাঁকে ভুলিয়ে পড়ার সময়টা ফাঁকি দিয়ে কাটিয়ে দেবার অছিলায় একজন উঠে হয়তো জিজ্ঞেস করলো, "সার, সার, ইষ্ট পিট কি ধাতু কি প্রত্যয়?" এক গাল হেসে ঝা-মশাই প্রশ্নকারীকে কাছে ডেকে বললেন, "ইষ্ট পিট? সে হচ্ছে ইষ্ট পূর্ব্বক পিট ধাতু এক—দুই—তিন—চার ঘা প্রত্যয়", বলে গুম্ গুম্ করে পিঠে চারটে বিরাশী শিক্কা ওজনের কিল্ বসিয়ে দিলেন। একটা হাসির ঝড়ের মধ্যে সেদিনকার পড়ার চাপটা অমনি সহনীয় রকম লঘু হয়ে গেল, চাই কি রসালাপে হাস্য পরিহাসে ঘন্টাকে ঘণ্টাই কাবার।

বেঁটে সেঁটে আকারে এতটুকু চন্দ্রবাবু চতুর্থ মাষ্টার ছিলেন নিতান্ত মাটির মানুষ, তাঁর রাগের ভান আর বেতের আস্ফালনে সারা ক্লাস পুলকে মুখর হয়ে উঠতো; গণ্ডগোল থামাবার জন্যে স্বয়ং হেড মাষ্টার মশাইকে প্রায় ছুটে আসতে হতো। শিশু-শাসনে শিশুর চেয়েও অসহায় এই মানুষটিকে কেউ আমলেই আনতো না, অথচ তাঁরও দিন সুখে দুঃখে আর দশ জন কড়া নিয়মবাগীশ রুদ্র মাষ্টারের মতই কেটে যেত। সেকেণ্ড মাষ্টার ছিলেন সব চেয়ে কড়া মানুষ, যেমন গম্ভীর তেমনি নীরব; তাঁর ধীর হিসেব করা হাঁটায় এমন এক জলজীয়ন্ত গুরুমশাই ছিল যে, তাঁকে ভয় ও সমীহ না করে উপায় ছিল না। এই মাষ্টার ছুটিতে যাওয়ায় থার্ড টিচার হয়ে আসেন বকুলাল বিশ্বাস ও তাঁর বন্ধু আসেন সহকারী হেড-মাষ্টারের পদে। এঁরা দু'জনেই ছিলেন ভক্ত বৈষ্ণব, সঙ্কীর্ত্তনে ও হরিনামে এঁদের চোখে ধারা বইতো। মাষ্টারে ও ছাত্রে গভীর প্রেম এই বকুবাবুকে দিয়ে আমি প্রথম বুঝি, আমাকে দেখবা মাত্র তিনি এমন ভালবেসে ফেলেছিলেন যে আমি তা' দেখে আশ্চর্য্য হয়ে যেতুম। এখন তিনি বোধ হয় মুন্সেফ, পথে ঘাটে আচম্বিতে ক্বচিৎ কদাচিৎ ছাড়া দেখা সাক্ষাৎ বড় একটা এখন আর হয় না। তার ওপর আমি ডাকসাইটে বোমাড়ে আর তিনি ক্ষুদে হাকিম, কাজেই এ অবৈধ প্রণয় মনে প্রাণে চেপে রাখা ছাড়া তাঁর গতি কি আছে?

স্কুলে ছাত্রদের মধ্যে খুব ভালবাসার জিনিস ছিলেন সখারাম বাবু। দীর্ঘছন্দ ঋজু দেহ, কেশ-বহুল বিস্তৃত বক্ষ, দ্রুত দৃঢ়সংকল্পের গতি, সুকৃষ্ণ গুম্ফ, ঘন ভ্রূযুগ, সুরসিক, সদাহাস্য পরায়ণ অথচ আদর্শবাদী এই মানুষটি ছিলেন ছেলেদের সব বড় অনুষ্ঠান আয়োজনের প্রাণ। আমাদের দরিদ্র ভাণ্ডার, কুষ্ঠাশ্রম সাহায্য সমিতি, সব কিছুর ইনিই ছিলেন নেতা। তখন ১৮৯৪ সাল, অত আগে আমরা এই সখারাম বাবুর প্রেরণায় দাড়োয়া নদীর শুষ্ক বালুচরে লাঠি খেলতুম; নন্দন পাহাড়কে দুর্গ করে একদল মোগল ও অন্য দল মাওলী সেনা সেজে যুদ্ধ করতুম। সখারাম বাবুর জীবনের সব চেয়ে বড় উচ্চাকাঙ্ক্ষা ছিল শিবাজীর জীবন-চরিত লিখে যাওয়া, মহারাজ বীর ছত্রপতির এত বড় শ্রদ্ধালু পূজারী আমি আর দেখি নি। এঁর প্রাণাগ্নির আঁচ পেয়ে আমরাও নেপোলিয়ন ও শিবাজীকে করেছিলুম জীবনের আদর্শ পুরুষ। কোথায় সাঁওতাল পরগণার এক নগণ্য স্কুলের ছাত্র আর কোথায় মহারাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাতা শিবাজী, হাজার অসম্ভব হলেও এরকম রঙিন বেহিসাবী আকাঙ্ক্ষাই মানুষকে বড় করে।

তখনকার দেওঘর স্কুলে আমার চেয়ে ভাল ছেলে অনেক ছিল, পরীক্ষায় তারা ফার্ষ্ট সেকেণ্ড হ'তো, রাশি রাশি পুরস্কার পেতো, মাষ্টারদের আদর কুড়োতো; কিন্তু আজ তারা জীবনের কর্মক্ষেত্রে কোথায়? দু' এক জন বড় চাকরী পেয়েছে, প্রফুল্ল মিত্র সায়েন্স কলেজের অধ্যক্ষ হয়েছে, কিন্তু অধিকাংশই তলিয়ে

গেছে নগণ্য লোকেরই জনতায়। একটা উঁচু আদর্শ নিয়ে জীবন উৎসর্গ তাদের একজনও করে নি, এক আমি ছাড়া। প্রথমে আমি পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্ত্তি হই, সেখান থেকে ছ'মাসে প্রমোশন নিয়ে চতুর্থ শ্রেণীতে উঠি, তারপর থেকেই দেওঘর স্কুলের ছাত্র জীবনে আমিই হই বড় বড় কাজে পালের গোদা। এই সময়ে যোগীন্দ্রবাবু প্রাণপাত করে দেওঘরে কুষ্ঠাশ্রম স্থাপন করছেন, তখনও তার রাজকুমারী কুষ্ঠাশ্রম নাম হয় নি। আমরা দরিদ্র ভাণ্ডার গড়ে বাড়ী বাড়ী হাঁড়ি রেখে চাল সংগ্রহ করে কুষ্ঠরোগী ও দুঃস্থ মানুষদের বিলোতুম। ডিবেটিং ক্লাব গড়ে ইতিহাস চর্চ্চা করতুম ও প্রবন্ধ লেখা আর বক্তৃতা দেওয়া শিখতুম, আমার কৈশোরের সে সব উদ্যমের আনন্দ ও নেশার ঘোর এখনও মনে পড়ে; আমার প্রাণ শক্তির বেগে আমি আমার কল্পনার রথের চাকায় বেঁধে টেনে নিয়ে চললুম প্রফুল্লকে, দীনেশ্বরী প্রসাদকে, করালী-কিঙ্করকে, আশু বিশ্বাসকে, এমন কত জনকে। তারা বোধ হয় আমায় ভালবাসতো বলেই সাড়া দেবার প্রাণপণ চেষ্টা করতো কিন্তু "স্বধর্ম্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্ম্মো ভয়াবহ"—সুতরাং এ পরধর্ম্ম আশ্রয় করে পরবর্ত্তী জীবনে তাদের একজনও টিঁকে থাকতে পারে নি।

এই সময় আমি দু'জন অপূর্ব্ব মানুষের সঙ্গ ও স্পর্শ পাই। একজন বরিশালের অশ্বিনী বাবু আর একজন "রসলীলা" রচয়িতা ইন্দু বাবু। ঈশ্বর প্রেমে পাগলের মত হয়ে ইন্দু বাবু একবার পর্য্যটক হয়েছিলেন। সেই অবস্থায় নিজের বীণাটি হাতে এই

ঈশ্বরপ্রেমিক সাধক দেওঘরে আসেন। আমার দাদাবাবু রাজনারায়ণ বাবুর কাছে এমন অনেক মানুষই আসতেন। এঁকে পেয়ে দাদাবাবুর আনন্দের অবধি ছিল না, পশ্চিম দিক্‌কার গোলাপ বাগানে ফুটফুটে জ্যোৎস্না রাতে ইন্দুবাবুর "রসলীলা" গান হতো,

সে কোন্ জ্যোছনা দেশ সই রে?
যেথা অগণন চকোর
মধুপানে বিভোর
নাহি জানে নিত্য সুখ বই রে?
যেথা পাষাণ ভেদিয়া ফুটে জীবনের ফুল রে
প্রাণময়ী ভাষা যথা নাহি তায় কুল রে
যে দেশের অভিধানে
দুখ মানে সুখ রে,
তুমি মানে আমি বই নই রে!

এই ধরণের গানগুলি এখনও আমার স্মৃতির ফলকে একেবারে মুছে যায় নি। তার পর ইন্দু বাবুর সে রসের উজান শুকিয়ে গেল, তিনি সংসারে ঢুকলেন, 'রসলীলা'ও আজ বাঙলা সাহিত্য থেকে লুপ্ত হয়ে গেছে। 'রসলীলা' আমার জীবনকে ঘোরাল রসাল করে দিয়ে গেছে, আমাদের পরিবারের ধর্ম-প্রাণতা আমি উত্তরাধিকার সূত্রে হয়তো কিছু পেয়েছিলুম কিন্তু সে উর্ব্বর জমিতে পাট করেছে জলসেচ দিয়েছে যে কয়খানি বই "রসলীলা"ই তার প্রথম।

"ভোমরা রে
কি মধু পিইয়ে হলি ভোর ?
তরল পরাণ তোর জমাট বাঁধিল রে !
গুন্ গুন্ গুন্ করে কত কেঁদেছিলি
কি মধু পড়িল মুখে চুপ হয়ে গেলিরে ।"

এই রকম ভাবের ও রসপূর্ণ কথা অকবিকে কবি করে ছাড়ে, আমি তো তখন তের বছর বয়স থেকে রাবীন্দ্রিক ঢঙে কবিতাই লিখছিলুম। প্রথমে কবি মানকুমারীর কবিতাই আমার কবিতা লেখার ছিল আদর্শ, তার পর এলেন তাঁর অপূর্ব্ব ঝঙ্কার ছন্দ ও মধু নিয়ে রবীন্দ্রনাথ। বৈষ্ণব কবিতা তখনও আমি পড়ি নি, রবীন্দ্রের 'ভানুসিংহের পদাবলী'তে তার একটু পূর্ব্বাস্বাদ পেয়েছি মাত্র।

অশ্বিনী বাবু বোধ হয় দু'বার দেওঘরে আসেন। সন্ধ্যার সময় তাঁকে নিয়ে আমরা বেড়াতে যেতুম, তাঁর ভক্তিযোগের সম্বন্ধে আলোচনা চলতো। তিনিও আমাকে বড়ই ভালবেসে ফেলেছিলেন। দাদাবাবুর তিনি ছিলেন অভিন্নহৃদয় সুহৃদ, আবার আমাদেরও ছিলেন তাই। এত শীঘ্র ষাট বছরের বুড়ো থেকে ছেলে অবধি সব মানুষকে আপন অন্তরঙ্গ করে নেবার শক্তি অশ্বিনী বাবুর মত আমি আর ২।৪ জনেরই মাঝে দেখেছি। ইন্দু বাবুর গানই মাত্র আমরা শুনতুম, তিনি ছিলেন বড়দের ও বুড়োদের সঙ্গী ; অশ্বিনী বাবু ছিলেন কিন্তু আবাল বৃদ্ধ যুবা সবার সমান দরদী।

এত অল্প বয়সে কবি হবার আর এক কারণ এই বয়সে আমার প্রথম প্রেমে পড়া। আমার সে প্রেমের পাত্রীকে যখন প্রথম দেখি তখন সে দশ বছরেরটি। বড় বড় ভাসা চোখ, গৌর বর্ণ, নাতি দীর্ঘ কিশোর তনু। এই ভালবাসা গভীর হয়ে আমার হৃদয় ও প্রাণসত্তা জুড়ে তের বছর অবধি ছিল। ব্রাহ্ম সমাজে বাল্য বিবাহ নেই, উপার্জ্জনক্ষম না হয়ে অন্ততঃ ছেলেরা সে সমাজে বিয়ের কথা ভাবেই না। আর অত ছোট বয়সের ভালবাসায় অতদূরের হিসেব কি থাকে? তার ওপর সে ছিল আমার নিকট আত্মীয়া, আমিও ছিলুম কবি, দেহ সম্বন্ধটার ওপর ছিল নবোঢ়ার ভয় সঙ্কোচ ও ঘৃণা। মাটির বুকের পদ্মটির জন্য আকাশচারী চাঁদের অতৃপ্ত আকুল পিয়াসা; পনরটি দিন ধরে কলায় কলায় পূর্ণ হয়ে উঠতে উঠতে সারা হৃদয় মণ্ডলের কিরণ ঢেলে দয়িতকে ছোঁওয়া, ঘিরে থাকা, ব্যাকুল করা, তাকে আলোর বন্যায় ডুবিয়ে রাখা আর তার পর তাকে না পাওয়ার শোকে আবার নীরবে কলায় কলায় ক্ষয়ে যাওয়া। এই রকম ছিল আমার কামগন্ধহীন সেই কৈশোর যৌবনের কবিত্বগাঢ় স্বপ্নালু প্রেম।

মানুষের জ্ঞান বুদ্ধির কি যে হিসেব,—মনের কৃত্রিম খোপ কাটা কাটা ভাল মন্দের উচিৎ অনুচিতের সে উদ্ভট মনগড়া রাজ্য,—সে হচ্ছে একটা আধ-আলো আধ আঁধারের ঘরকন্না। নিজেদের ছোট ছোট ব্যক্তিগত ও পারিবারিক স্বার্থবুদ্ধি ও হিসাব কিতাব থেকে মানুষ সেখানে গণ্ডী কেটে নিয়েছে,—

'ঐইটে আমার—ঐটাকে ছুঁয়োনা' "ঐটে তোমার—ঐখানেই সারা জন্ম ঘুর ঘুর করে মর"। আমাদের মন হচ্ছে হিসাবী লোক, লাভ লোকসান খতিয়ে সে চলে, নিয়মকে—ব্যবস্থা পত্রকে কঠিন দুর্লঙ্ঘ্য করে সে বাঁধে, পান থেকে চূণ খসলে সে ভাবে চৌষট্টি নরক তার নীচে হাঁ করে রয়েছে তাকে গেলবার জন্য। অথচ বিবাহের বা মিলনের প্রধান জিনিষটা হচ্ছে হৃদয় বিনিময়—ভালবাসা, প্রেমকে বাদ দিয়ে বিবাহ হয়ে পড়ে প্রহসন, ব্যভিচার। দেহের ক্ষুধা মেটাবার ব্যবস্থার নামই যদি হয় বিবাহ তা'হলে রামকে বাদ দিয়ে রামায়ণের মত প্রেমকে বাদ দিয়ে বিবাহ একটা পাশব ব্যবস্থা ছাড়া আর কি? কত যে পরিবারে আমি দেখিছি অতি নিকট আত্মীয়ে আত্মীয়ে প্রণয়, যারা সারাটা জীবন হয়তো এক পরিবারের বাঁধনে পরস্পরকে কত না সুখে দুঃখে ধরে একত্র থাকে, তাদের একজন আর এক জনকে টানবে এ তো খুবই স্বাভাবিক। তবু কিন্তু বিজ্ঞানের হুকুম, সমাজের ব্যবস্থা এই যে—রক্তের সম্বন্ধ যেখানে গাঢ় ও নিকট সেখানে মিলন অবৈধ। কাজেই কত না পরিবারে কত না প্রেম অন্তঃসলিল হয়ে মরেছে, অন্ধকারে ঘুলিয়ে ঘুলিয়ে পাক তুলছে, গোপন ভ্রূণহত্যা, নারীঘাত ও প্রবঞ্চনার সৃষ্টি করছে। মানুষের মনগড়া নীতির সামাজিক জগতে তাই পাপের অপ-রাধের ও মনস্তাপের আর অন্ত নেই।

মানুষ ভুলে যায় যে, মানুষ শুধু মন নয়, শুধু প্রাণ নয়; প্রাণ, মন, হৃদয় ও দেহ এই চারটেকে নিয়ে সে একটা গোটা সত্তা।

তার হৃদয়ের প্রেম দেহ প্রাণ মন সব নিয়েই জাগবে, মনের খোঁটায় বাঁধা হয়ে হৃদয়ের গণ্ডীতেই আটকে থাকবে না, দেহের ক্ষুধার রাজ্যেও সে পঙ্কজিনী ফুটে উঠবে দেহের মিলন-রসে শতটি প্রস্ফুট দলে। সেইটেই স্বাভাবিক, প্রকৃতির নিয়মই যে তাই। কুলের বংশের গোত্রের বাহির থেকে তাজা নতুন রক্ত না এলে জাতি নাকি সুস্থ সবল হয়ে ওঠে না; বেশ কথা, কিন্তু এ যেমন একটা নিয়ম, তেমনি হৃদয়ের প্রাণের ও দেহের রাজ্যের আরও হাজারটা নিয়ম যে রয়েছে যার বশে একজন আর একজনকে না টেনে না ভালবেসে পারে না; সে টান ব্যর্থ করলে স্নায়ুমণ্ডল আঘাত পায়, ছিঁড়ে যায়, মানুষ পাগল হয়ে আত্মঘাতী হয়, হিষ্টিরিয়ার রুগী হয়ে সারা জন্ম থাকে। অতি জটিল সুকুমার যন্ত্র হচ্ছে মানব সত্তা—তার মন প্রাণ হৃদয় দেহময় এই চতুর্ম্মুখ চেতনা। একটা মাত্র নিয়মকে কঠিন rigid করে জীবনের আরও অসংখ্য ধারাকে অবহেলা ও দমন করতে গিয়ে ট্র্যাজেডিই বাড়ে,—জীবন ও সমাজ দেহ বিষিয়ে ওঠে। রক্তের সম্বন্ধ যেখানে নিকট সেখানে বিবাহকে অবৈধ করে যেমন একদিক দিয়ে রেখেছি আবার অন্যদিক দিয়ে কৌলিন্যের লোভে ক্রমশঃ দু' চারটি পরিবারে বিবাহ করে সেই নিয়মেই ব্যভিচার আমরা নিত্য নিয়ত করছি। কে জানে বাঙ্গালী জাত হয়তো তাইতেই এত নিস্তেজ দুর্ব্বল ও ক্ষীণপ্রাণ হয়ে পড়েছে কি না? কূপমণ্ডূক এ জাতির বিবাহপ্রথা এত সঙ্কীর্ণ, ছত্রিশ জাতের আর শত শত উপজাতের গণ্ডীতে গণ্ডীতে এমন করে বাঁধা বলে

নতুন তাজা রক্ত এ জাতির পচা ঘুণধরা দেহে বহুদিন আসে নি। অথচ পূর্ণ জীবনের উজ্জ্বল দিনে হিন্দুর এ ব্যবস্থা ছিল না, অনুলোম ও বিলোম বিবাহে নিকৃষ্ট উৎকৃষ্ট সব জাতের মানুষ এসে হিন্দু-সমাজ-সাগর-সঙ্গমে মিলতো।




SARASWAT LIBRARY
Estd:-1919.
MAKARDAH-HOWRAH.

দশ

প্রথম কৈশোরের এই ভালবাসা আমার সারা কৈশোর ও প্রথম যৌবন জুড়ে অবিকৃত ছিল—আত্মীয় স্বজনের চোখের অন্তরালে অন্তঃসলিলা ফল্গুস্রোতের মত। সে কথা শুধু সে জানতো আর আমি জানতুম; তবে অত ছোট বয়সে সে এ ভালবাসাকে ঠিক বুঝতো কিনা জানি নে, বালিকা ও কিশোরী স্বভাবের প্রেরণায় নিতান্ত অবহেলায় সে অর্দ্ধসজ্ঞানে তা' নিজের রূপের মন্দিরের প্রাপ্য পূজা বলেই হয়তো আত্মসাৎ করতো। আমার প্রথম প্রেম ছিল অশ্রুতে ভরা, বিষাদ-কুয়াসায় আচ্ছন্ন কোজাগরী রাত। বার বছরেরটি হয়ে সে ভালবাসতো আমার এক মাসতুত ভাইকে, আমার দিকে তাঁর রূপমদির চোখে কতই না অবহেলায় চেয়ে আঁচল উড়িয়ে চলে যেত; আমার বুকটা নিঙড়ে সে ছপোদা'র দলে গিয়ে মিশে

কাপাটি খেলতো, আমার দু'চোখ ফাটিয়ে জল বের করে অম্লান বদনে তারই হাত ধরে সে বেড়াতে বেরুতো, আমার জগৎ সংসার উদাস করে দিয়ে তারই পাশটি ঘেঁষেই বনভোজনে বসতো। আমি আর সহ্য করতে না পেরে মাঠের মাঝে পাথরের উপর গিয়ে বুক চুরমার করা আবেগে বিরহের কবিতা লিখতুম। এই ছেলেমানুষ প্রেমের মাঝে ছিল করুণ ও হাস্যরস দুই-ই।

আমরা ভাবি নারী বুঝি বড় নিষ্ঠুর, এমনই করে কতই না ক্ষেত্রে সে নির্দ্দয় পাষাণের মত প্রেমার্থীর ভিক্ষা পায়ে দলে চলে যায়, অক্লেশে তারই চোখের ওপর আর একজনকে অযাচিত হয়ে চাওয়ার অধিক দিয়ে দেয়। নারীকে নিষ্ঠুর পাষাণী বলবার সময় আমরা ভুলে যাই সেও ইচ্ছা অনিচ্ছার দাস মানুষ, তারও কাউকে ভাল লাগে, কাউকে ভাল লাগে না—প্রতিদান নির্ব্বিশেষেই। আমি তাকে হাজার চাইলেও তার হৃদয়ের দিগদর্শনের কাঁটাটি যদি আমার দিকে না ঘোরে তা' হ'লে সে করবে কি? এই একাঙ্গী প্রেমের খেলা সারা জগৎ জুড়ে চলছে, এর ট্রাজেডির বেদনায় পশু উদ্ভিদ ও জড় জগৎ অবধি থর থর আবেগে কাঁপছে। ভাল আমরা নিতান্তই অবশ হয়েই বাসি, একেবারেই হিসাব-হারা সে প্রেম, বিজ্ঞান সে মানে না, নীতি নরকের ভ্রূকুটির ধার সে ধারে না, সুরে বাঁধা বীণার মত বাজিয়ের হাত পড়লেই আত্মহারা হয়ে সে বেজে ওঠে। তার চাঁদটি উদয়াচলে পূর্ণ ষোল কলায় দেখা দিলেই তার সাগর-

বক্ষ দুলে কেঁপে উজ্জান ডাকে। এহেন প্রেমের ব্যাপারে যারা উচিত অনুচিতের কথা বলে তারা নীতির ঠুলি চোখে রাতপেঁচা, তারা প্রকৃত প্রেমের ধারা কি বা জানে? প্রেম দূরে থাক, হীন কামের খেলায়ই মানুষ কতখানি অবশ হতজ্ঞান হয়ে পড়ে তার সন্ধান আমাদের হিন্দু সমাজের উন্নত কালের সমাজকাররা জানতেন! মনু পরাশরে তাই হিন্দু প্রায়শ্চিত্য বিধিতে দেখতে পাই শত শত রকম স্বাভাবিক অস্বাভাবিক মৈথুনের তালিকা ও তার জন্য কতই না হালকা হালকা প্রায়শ্চিত্য বিধি। কোন্ বিবাহকে তাঁরা বৈধ করে না নিয়েছিলেন, শ্রেণী বিভাগে তাহাদের নিকৃষ্ট স্থান দিলেও রাক্ষস বিবাহ অবধি ছিল সে যুগে বৈধ। তন্ত্র করে গেছেন যবনীকেই ও নষ্টা স্ত্রীকে সাধনার শ্রেষ্ঠ শক্তি। আর আজ আমরা কতখানি হৃদয়হীন, কতদূর অনুদার, তাই আমাদের সমাজ ভরে গেছে ব্যভিচারে, ভ্রূণহত্যায়, নারীঘাতে, আত্মহত্যার পাপে; মা বাপ আত্মজন নিজেদের নাড়ী ছেঁড়া বুকের মেয়েকে নিজের হাতে ঠেলে দিচ্ছে গণিকার পথে, নিজের হাতে তার হাতে তুলে দিচ্ছে বিষের পাত্র। মানুষ যেখানেই হয়েছে এই ভগবানের জগতে বিচারক সেইখানেই সে ধর্মের সমাজের নামে সেজেছে শয়তান। সে নিষ্ঠুরতার তার অবধি নেই। হিংস্র বাঘের তবু নিষ্ঠুরতার সীমা আছে, সেও আপন সন্তান চেনে। কিন্তু ধর্মের নামে যে অন্ধ হয় তার নিষ্ঠুরতাই কল্পনায় গড়েছে চৌষট্টি নরকের বিভীষিকা।

এই প্রথম ব্যর্থ প্রেমের ব্যথাই আমার কবিত্বের স্রোত খুলে দিয়েছিল। আমার কিশোর চিত্ত দয়িতকে ঘিরে আকুল আকাঙ্ক্ষায় গুন্ গুন্ করে ফিরতো, প্রেমাস্পদের বুকের কোরকটি তার মধু ও পরাগকোষ নিয়ে আমার কাছে খুলতো না বলে তাকে ঘিরে সে গুঞ্জনের আর বিরাম ছিল না। সে দেওঘর থেকে চলে গেলে চিঠি লিখতুম ভাষাকে বুকের মধুতে ডুবিয়ে ডুবিয়ে কত না মিষ্টি করে, সে তা' পড়ে অবাক বিস্ময়ে বলতো—'এমন সুন্দর চিঠি আমি তো লিখতে পারি নে' ; অথচ ছোট হলেও সে আমার অনেক ওপরে পড়তো, আমার দু' বছর আগে সে প্রবেশিকায় উত্তীর্ণ হয়। তার হৃদয় যে শুষ্ক, প্রেম যে তার গুরু হয়ে বসে নি ভাষায় ছন্দ ও মধু আনতে! তার ওপর আমাদের দেশে মেয়েদের শিক্ষা তখন এমন নিকৃষ্ট ছিল যে সে দু' ছত্র ইংরাজি অবধি বলতে বা লিখতে পারতো না আর আমি তার দু' ক্লাস নীচে পড়েও কবিত্বে ষ্টাইলে অনবদ্য করে পাতার পর পাতা ইংরাজি লিখে চলতুম। সেই থেকে সুন্দর করে গুছিয়ে চিঠি লেখার ক্ষমতা আমার মাঝে গজাতে লাগলো। বোমার যুগে ধরা পড়ায় আমার কৈশোরের যৌবনের সাথীগুলিকে লেখা শত শত চিঠি তাদের বাপ মা ভয়ে আতঙ্কে পুড়িয়ে ফেলেছেন। নইলে সে হতো এক অপূর্ব্ব পত্রাবলীর সংগ্রহ।

আমার বড় মামা ছিলেন ভারি চমৎকার মানুষ। তাঁর কথায় কথায় দুলে দুলে নিঃশব্দ চাপা হাসির ঝড় তোলা এখনও

আমার মনে পড়ে। গৌরকান্তি পুরুষ, চিরকুমার, স্বাধীনচেতা, ইংরাজ-বিদ্বেষী বড় মামা আমার জীবনে কখন সরকারী চাকুরী করেন নি, নইলে দাদাবাবুর বন্ধু সার হেন্‌রি কটন আদির আনুকূল্যে তিনি অনেক উচ্চপদই পেতে পারতেন। সে কালে শুধু কাগজে লিখে মাসে দেড় শ, দু'শ, কখন কখন আড়াই শ' টাকা অবধি তিনি রোজগার করেছেন। বেঙ্গলী, ইণ্ডিয়ান মিরর, হোপ, অমৃত বাজার আদি কাগজে তাঁর লেখা সম্পাদকীয় স্তম্ভে প্রধান প্রবন্ধ হয়ে বের হতো। সাংবাদিক Journalistic ইংরাজি তিনি লিখতে পারতেন অতি চমৎকার।

দাদাবাবু রাজনারায়ণ বসুর বংশটাই ছিল ইংরাজ-বিদ্বেষী। যৌবনে ভারত মেলার অনুষ্ঠান করে দাদাবাবুরা বিরাট জন-সভায় গোটা কয়েক মঞ্চ করে তার ওপর দাঁড়িয়ে আবৃত্তি করাতেন কবি হেমচন্দ্রের "বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে, সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে, ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়", তাঁদের অদ্ভুত গুপ্ত সমিতির কথা আত্মকাহিনীতে ইতিপূর্ব্বেই লিখেছি। পথে চলতে চলতে শ্বেতশ্মশ্রু সেই কুব্জ মানুষটি ইংরাজ দেখলেই সগর্ব্বে বুক ফুলিয়ে চলতেন, কটমট করে রক্ত চক্ষে সে বেচারীর দিকে চাইতেন, দাঁতে দাঁত দিয়ে ঘুঁসি পাকিয়ে মনের ঝাল তাঁর মেটাতেন। অথচ কোন ভাল ইংরেজ বাড়ীতে এলে সৌজন্য ও ভদ্রতার অবধি থাকতো না। সিপাহী যুদ্ধের কত গল্পই আমরা দিদিমা, দাদাবাবু ও বড় মামার মুখে শুনেছি।

হেডমাষ্টার যোগীনবাবুর সঙ্গে জুটে বড়মামা কিছুদিন

একখানি সাপ্তাহিক কাগজ বার করেন, বোধ হয় ৯৩ বছর সেখানি চলেছিল; দেওঘরের বাড়ীতে আমরা তার ফাইল ছেলেবেলায় দেখেছি। দাদাবাবু ও বড় মামার আলমারি ভরা বই পড়ে আমার যা' কিছু লেখা পড়া শেখা। নিতান্ত ছেলে-বেলায় দাদাবাবুর দেখাদেখি যখন উপনিষদ গীতা ও পুরাণ পড়তে চেষ্টা করেছি তখন সংস্কৃতের কোন বোধই আমার গজায় নি। বারবছর বয়স থেকে নভেলের তো আমি ছিলুম পোকা। স্কুলের বই ছাড়া বাইরের বই পড়ার ঝোঁক আমাকে দিয়েছিলেন হেডমাষ্টার মশাই, সখারাম বাবু, বড় মামা ও দাদাবাবু। তারপর এলেন মেজদা ও সেজদা—দুই-ই সমান গ্রন্থকীট, তাঁদের অপূর্ব্ব পুস্তক সংগ্রহ নিয়ে আমার জ্ঞান-তৃষ্ণার্ত্ত জীবনে দু'জনে পূর্ণচন্দ্রের মত উদয় হলেন। সে কথা পরে বলবো।

দেওঘর স্কুলে ছাত্র জীবনে বলতে গেলে আমার অভিভাবক কেউ ছিলেন না। নামে মাত্র অভিভাবক ছিলেন দাদাবাবু ও বড়মামা। যখন নীতি-বাগীশ আত্মীয়রা হঠাৎ আবিষ্কার করলেন, যে, আমি লুকিয়ে লুকিয়ে রাঙা মাকে চিঠি লিখি তখন একটা ধমক চমক টিকা টিপ্পনীর ঝড় উঠলো—একেবারে Tempest in a Tea pot আর কি। তাঁরা সব এসে দল বেঁধে দিদিমাকে মুখপাত্র করে দাদাবাবুর কাছে লাগালেন, "ও যদি এ রকম কেলেঙ্কারী করে, একটা বাজারে বেশ্যার সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, তা' হলে ওর বোনের বে হবে না যে!" কি অকাট্য যুক্তি নিষ্ঠুরতা ও নির্ম্মমতার সপক্ষে!

দাদাবাবু দু' হাত ও দাড়ি নেড়ে বলে দিলেন, "ও যা খুসী তাই করবে, ও একেবারে স্বাধীন।" বাস, তারপর আমার যবনিকার অন্তরালে দাঁড়িয়ে উল্লাসে নৃত্য ও প্রতিপক্ষদের মুখ কাঁচু মাচু করে কাষ্ঠ হাসি হেসে সরে পড়া। রেগে মেগে দিদিমা বললেন, "এঃ! বুড়োর ভীমরতি ধরছে, কথার ছিরি দেখো না!" দাদাবাবু কৃত্রিম রাগ দেখিয়ে দন্ত কিড়িমিড়ি করে ইসারায় দেখিয়ে দিলেন যেন কার মুখ ধরে মেঝেয় রগড়াচ্ছেন আর মুখে বললেন, "বেওকুফ কুফ্—কুফ্—কুফ্!" তাঁর গালাগালের ভাণ্ডারে ওর বেশী সঞ্চয় আর ছিল না, খুব রাগলে ঐ পর্য্যন্ত বলতেন।

বড় মামারও সেই মত সেই রায় সুতরাং আমায় পায় কে? আমারই পোয়াবারো। বোধ হয় ছয় মাস কি এক বছর দেওঘরে থাকার পর একদিন স্কুলে বের হচ্ছি, বাগানের কাছে দেখি পাকা বাঁশের লাঠিটি হাতে রামরাজ তেওয়ারি স্বশরীরে দাঁড়িয়ে। আমি তো অবাক, "দারোয়ানজী! তুমি এখানে?"

দ। হ্যাঁ, অনেক দিন তোমাদের দেখিনি, তাই দেখতে এলুম।

রামরাজ অনেক কথাই জিজ্ঞেস করতে করতে আমার স্কুল পাঠ্য বইএর বোঝা নিজের হাতে বয়ে নিয়ে মাঠের পথে মহুয়া বন দিয়ে আমার পাশে পাশে চললো। স্কুলের কাছাকাছি এসে বইগুলি আমায় ফিরিয়ে দিয়ে বললো, "বাবা, মা এসেছেন।" আমি তো হতভম্ভ! মা! এখানে মা?

"হ্যাঁ, মা তোমার জন্তে কেঁদে কেঁদে যে অন্ধ হবার দাখিল। চলো, একবার দেখা দেবে চলো। এতক্ষণ তোমায় বলিনি, ভাবলুম আগে একবার মনটা বুঝে দেখি।

চিরদিনই আমি চুরিচামারী ও ষড়যন্ত্রে ত্বরিত-কর্ম্মা, এসব ক্ষেত্রে উপস্থিত দুষ্টবুদ্ধি কেমন যেন দরকার হ'লেই জুটে যায়। দু'জনে পরামর্শ করে ঠিক হ'লো টিফিনের সময় বাড়ীতে কাজ আছে অছিলায় হেডমাষ্টার মশাইএর কাছে ছুটি নিয়ে বেরিয়ে পড়া যাবে আর ঠিক সাড়ে চারটের সময় ভাল ছেলের মত যেন সোজা স্কুল থেকেই সুড় সুড় করে রাড়ী ফেরা যাবে। যে পরামর্শ সেই কাজ। হেডমাষ্টার আমায় খুব নীতিবাগীশ ভাল ছেলে বলে জানতেন, আমি মিথ্যা কথা বলবো এ তাঁর স্বপ্নের অগোচর। এক পাণ্ডার বাড়ীতে গিয়ে দেখি ঘরের দুয়োর ধরে আবেগকম্পিত হৃদয়ে জীর্ণা শীর্ণা মা আমার ছেলের প্রতীক্ষায় অনাহারে দাঁড়িয়ে আছেন। আমাকে দেখে কোলে নেবেন কি, স্নেহাবেশে উত্তেজনায় থর থর করে কাঁপতে লাগলেন, চোখ দুটি অশ্রু ধারায় ঝাপসা হয়ে গেল, কোন গতিকে আমাকে বুকে কুড়িয়ে নিয়ে নির্ব্বাক আবেগে সে কি ব্যাকুল তাঁর কান্না। স্নেহ ভালবাসা একটা সাইক্লোনের মত, ঠিক কুটো-টুকুর মত অসহায় করে ঐ ঝড় আমাদের কোথায় যে নিয়ে ফেলে তা' বলা শক্ত। একজন খুব বড় সাধিকা যোগসিদ্ধা মেয়েকে আমি দেখেছি একটি বেরালকে প্রাণ ঢেলে ভালবাসতে। অতবড় স্থির ধীর ধ্যানী মেয়ে যখন বার ঘণ্টা পরে হারানো

বেরাল খুঁজে পেল তখন তাকে বুকে জড়িয়ে ধরে আবেগে হাঁপাতে লাগল। সে বেগ শান্ত হতে গেল পাঁচ মিনিট, ততক্ষণ মুখে তার আদরের ভাঙ্গা ভাঙ্গা আবোল তাবোল ভাষা, সারা শরীরে কম্প ও রুদ্ধশ্বাস বুকে শ্বাসকষ্ট।

মায়ের আমার প্রতি এই ভালবাসা যখনই দেখতুম আমি বিস্ময়ে থ' হয়ে থাকতুম। পরবর্ত্তী জীবনে আমি বুঝেছি এ ভালবাসা কি পর্য্যন্ত আকুল করা। হৃদয়ের বাঁধ একবার ভেঙ্গে সংযম হারিয়ে গেলে এর বেগ হয় অন্ধ ও একেবারে বাণ ডাকা রকমের দুর্জ্জয়। আমাদের প্রাণ ও হৃদয়ের ভূমিতে এ অগ্ন্যুৎ-পাৎ অহরহই হচ্ছে। সমাজ এখানে পরাস্ত, ধর্ম্ম এখানে নির্ব্বাক, মানুষ খুব দৃঢ় ইচ্ছা শক্তি না থাকলে এ বেগের মুখে ভাসমান ঐরাবত।

এগার

তারপর রোজ স্কুলের ছুটির পর এবং কখন কখন স্কুল থেকে পালিয়ে রাঙা মায়ের কাছে পাণ্ডার বাড়ীতে আমার হাজরে দেওয়া অবাধে চলতে লাগল। দশ পনর দিন সেখানে থেকে তারপর পাষাণে বুক বেঁধে মা আবার কলকেতায় ফিরে গেলেন। সেই সময়ে এবং পরে মায়ের মুখে শুনেছিলুম আমাদের ছিনিয়ে নেবার পর বাবার আমলের এই পুরাতন চাকর রামরাজ ছাড়া আর কেউ অসহায় নির্ব্বান্ধব মাকে আমার দেখে নি। যতদিন না মা বৈঠকখানা অঞ্চলে একটি বাড়ী কিনে ঘর বাঁধলেন এবং আমার বন্ধু সুরেন মায়ের ভার নিল ততদিন রামরাজ তাঁকে আগলে ছিল, ছেড়ে ততদিন কোথায়ও যায় নি।

এরপর দ্বিতীয়বার যখন মা দেওঘরে এলেন তখন মায়ের অর্দ্ধ অঙ্গ পক্ষাঘাতে পড়ে গেছে, জ্বর বিকারে তিনি বেহুঁস ও অচেতন। সুরেন ঠিক কচি ছেলের মত কোলে সেই জ্বর বিকারের রোগীকে ট্রেণ থেকে দেওঘরে নামিয়ে নিল, পোষ্ট অফিসের কাছাকাছি একটি বাড়ী ভাড়া করে মাকে রাখা হ'লো। সেবার দেওঘরে তাঁকে কয়েকমাস থাকতে হয়েছিল। জ্বর ত্যাগ হয়ে শরীরে বল এসে কবিরাজী চিকিৎসায় পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেহ কতকটা সুস্থ হলে পর মা আবার কলকেতায় ফিরে গেলেন। তার অনেক পরে রামরাজকে দেখেছি কলকেতার শেরিফের তকমা ঝুলিয়ে সুকিয়া ষ্ট্রীটে শেরিফ সাহেবের বাড়ীর দরজায় বসে থাকতে। আমি তখন বেকার অবস্থায় ঘর সংসার আত্মীয় স্বজন ছেড়ে কলকেতার মেসে বাস করছি আর সংবাদপত্রে ওয়াণ্টেড কলম দেখে দেখে মরিয়া হয়ে আবেদন নিবেদন ঝাড়ছি। এহেন নিঃস্ব আমাকে দেখলেই সে উঠে দাঁড়িয়ে ধনীর দুলালের প্রাপ্য সসম্ভ্রম অভিবাদন জানাত।

মা দ্বিতীয়বার দেওঘরে থাকতে একদিন কানা ঘুষায় তা' শুনতে পেয়ে দিদিমা আমাকে স্পষ্ট জিজ্ঞাসা করে বসলেন। আমি স্বীকার করে বললুম, যে, হাঁ, রোগ হয়ে মা চেঞ্জের জন্যে এসেছেন দেওঘরে। তখন দিদিমা বললেন "আমরাও সেদিন দেখেছি, আমাদের বাড়ীর সামনে দিয়ে খোলা ফিটনে বিবি সেজে যাচ্ছিল।" শুনে তো আমি পেটের হাসি চেপে রাখতে পারি নে। অনাথিনী মা আমার একবস্ত্রে বিধবার বেশে কত

নিষ্ঠায় জীবনটা কাটিয়ে দিলেন আর তাঁকে কিনা এরা দেখলো খোলা ফিটনে বিবির বেশে! সমস্ত দিন ধরে গোটা পরিবারটা মিলে সে কি জটলা, কি ঘোঁট। অন্তঃপুরে বাঁধা একঘেয়ে জীবনে এমন মু'রোচক চাটনী বড় একটা সচরাচর জোটে না; যদি বা ভাগ্যক্রমে জুটেই গেল তাকে কি ছাড়া যায়, জল্পনায় কল্পনায় ঘোরাল রসাল করে তাকে জিবে উল্টে পাল্টে চেটে উপভোগ তো করে নিতেই হবে। বৈদ্যনাথে দিদিমার বাড়ীর এই কূপমণ্ডুক পরিবারটির এই রকম পরচর্চ্চার খোরাক আমি জীবনে অনেকবার জুটিয়েছি, পুরো বিপ্লবী হয়ে আত্মপ্রকাশ করার পর থেকে তো "বেরেটার কীর্ত্তি"ই ছিল এদের সান্ধ্য বৈঠকের ঘোট পাকাবার বিষয়। সে সব বৈঠকে তিল হ'তো তাল, স্বয়ং বড়মামা ভিতরে বারাণ্ডায় লম্বা লম্বা পা ফেলে অবিশ্রান্ত পায়চারি করতেন এবং ফোড়ং কেটে কেটে জল্পনারত মেয়েদের কাছে 'বেরেটার' কারসাজি রঙিয়ে ফলিয়ে উজ্জ্বল করে তুলতেন। 'আমি দিব্যচক্ষে দেখছি ওকে একদিন ধরে আম গাছে লটকে দেবে'—বলে এমন কালো tragic রঙে বড়মামা আমার ভাবী দুরদৃষ্ট ও দুর্গতির ছবি আঁকতেন যে সবাই ভীত কণ্টকিত শরীরে মহা পুলকে তাতে সায় না দিয়ে পারতো না। বড়মামার মনটা ছিল ইংরাজ-বিদ্বেষী প্যাট্রিয়ট আর প্রাণটা ছিল তখনকার সাবধানী বাক্যবাগীশ ভীরু বাঙ্গালী। তার ওপর আড্ডা দেবার লোভ তাঁর ছিল প্রচণ্ড, ইংরেজের বিপুল শক্তি আর আমাদের ঢাল তলোয়ারহীন নিধিরাম সর্দ্দারী

ভেবে তিনি হয়ে পড়তেন যেন একেবারে স্নেহকাতর ভীত পিসীমাটি।

অকল্যাণ, অপযশ, বিপদ আপদের একটা দুর্দমনীয় টান আছে; কাজেই পরের ভাগ্যে সে রকম একটা কিছু ঘটলে পাড়া-পড়শীর পক্ষে তা' হয় একটা চাপা আনন্দের. ঘটনা। পরম আত্মীয়ের জীবনে ঘটলেও তা সুখদুঃখ মিশ্রিত একটা উৎকট টানের বস্তু হয়ে দাঁড়ায়। 'আমার ছেলেটি যায় যায়'—একথা ভাবতে এবং তা' ক্রমাগত ভেবে ভেবে বিনিয়ে বিনিয়ে কাঁদতে মা বাপের একটা তীব্র অস্বাভাবিক সুখ হয়; এমনি করে দুঃখকেও মানুষ অহরহ ভোগ করছে; এই জন্যে ট্রাজেডিই মানুষের জীবনের সব চেয়ে রসঘন বস্তু, ট্রাজেডি না হলে নাটক জমে না, ট্রাজেডি বিনা ফিল্মকে দিয়ে শ্রোতাকে thrill দেওয়া শক্ত হয়, কারণ হাসি ও কান্না একই স্নায়বিক উত্তেজনার দু'টো এবং কান্নাটাই তার মধ্যে সব চেয়ে স্নায়ু-সুখকর ও উত্তেজক ব্যাপার। 'পাতালপুরের দুয়ার' গল্পে এই দুঃখের অকল্যাণের ডাক যে কত সম্মোহন তা' কতকটা দেখিয়েছি।

দরবারী কাহার ছিল দেওঘরে পুরন্দাহায় পাল্কীবেহারাদের চাঁই, সে ও তার ভাই বনোয়ারী ও আস্রফিয়া আমাদের বাড়ী মাঝে মাঝে চাকরী করতো। মাকে একবার নন্দন পাহাড় দেখাতে নিয়ে যাবার সময় এই দরবারীদের পাল্কী ভাড়া করা হয়, তাদেরই মুখে দিদিমারা মায়ের দেওঘর আসার খবরটা পান! আমার নিজের গর্ভধারিণী মা থাকতেন রোহিণীতে একা,

তারিণী বাবুদের বাড়ীতে, তা' আগেই বলেছি। মাসান্তে এক আধবার রবিয়া বা আস্রফিকে সঙ্গে নিয়ে আমি মাকে দেখে আসতুম। একবার পাল্কী করে গিয়ে ফিরবার পথে রাত হয়ে যায়, একে অন্ধকার রাত, তায় উঠলো প্রচণ্ড ঝড় ও মুসলধারে বৃষ্টি। দরবারীরা পাল্কী নিয়ে দাড়োয়া নদীর ধারে এসে দেখলো নদীতে বিপুল বাণ এসেছে, একূল ওকূল ভরা দুর্ব্বার তরঙ্গক্ষুব্ধ ঘোলা জল, তাতে নামে কার সাধ্য। তখন মাঠে ধান ক্ষেতের আলে আলে সেই দুর্ভেদ্য অন্ধকারে কোন গতিকে বিদ্যুতের আলোয় পথ দেখে দুই ক্রোশ দূরে ব্রিজের ওপর আসা গেল। পাল্কী সমেত অতি সন্তর্পণে ব্রিজ পার হয়ে বাড়ী পৌছান গেল, তখন রাত বারটা। আর একবার এমনি দুর্য্যোগে পড়েছিলুম বাবার সঙ্গে খুলনায়। বাগেরহাটে কোথায় এক গ্রাম্য স্কুলে বাবা গেছিলেন পারিতোষিক বিতরণে সভাপতি হয়ে, আমি গেছিলুম সঙ্গে। ফিরতি পথে থালে থালে ভরা মেঠাই-মণ্ডায় আমাদের নৌকো বোঝাই করে আধপথে আসতে না আসতে ঝড় উঠলো। নৌকা ডুবু ডুবু দেখে এক আঘাটায় নৌকো বেঁধে আমাকে পাল মুড়ি দিয়ে ডাঙ্গায় বসিয়ে রাখা হ'লো, ঝড় থামলে আমরা ভিজে তোয়ালে পরে বাড়ী এলুম। সেই থেকে কেমন এক রকম হয়ে গেছে; সত্তার স্নায়ুমণ্ডলে কোথায় একটা ভয়ের ছাপ পড়ে আছে, ভিজে পূবে বা উত্তরে হাওয়া অন্ধকার রাত্রে মাঠের পথে বইলেই কেমন একটা অসহায় ভাব মনে জাগে, বুক গুর গুর করতে থাকে।

দ্বিতীয়বার রোগ সেরে মা চলে গেলেন। স্নিগ্ধ ঝির ঝিরে উষায়, মহুয়ার গন্ধে, মহিষ চড়া মেঠো রাখালের বাঁশীতে, মাঠ ছাওয়া পলাশের রক্তিমায় আরো দু'তিন বছর আমার কেটে গেল। ইতিমধ্যে বিলেত থেকে দাদা দেশে এলেন, তার পরে এলেন সেজদা, সব শেষে এলেন মেজদা'। যতদূর মনে আছে দেশে এসে মেজদাই আগে দেওঘরে আসেন, দাদা আসেন সব শেষে। সেজদা শ্রীঅরবিন্দের সঙ্গে দাদাবাবু রাজনারায়ণ বসুর খুব মনের মিল হয়েছিল, মেজদা কিন্তু বাঙলা ভাষাকে monkeys jabber বলাতে দাদাবাবুর সঙ্গে তাঁর ভাব গোড়াতেই চিড় খেয়ে গেল। মেজদা ও সেজদা দুজনেরই সঙ্গে আমি প্রথম দেখায় লুকোচুরি খেলেছি, কত ফষ্টি-নষ্টী করেছি, সমানে সমানে ইয়ার্কি দিয়েছি। মেজদা ঢাকার ব্রাহ্ম কৈলাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মেয়েকে বিয়ে করায় অসবর্ণ বিয়ের বিরোধী দাদাবাবু আর তাঁর মুখ দেখেন নি। পূজোর ছুটিতে সেজদাই বছর বছর আসতেন আর আমাকে দেশপ্রীতি ও দেশসেবার সম্বন্ধে বোঝাতেন।

এত ঘটনার মধ্যেও অন্তঃসলিলা ফল্গু ধারার মত আমার প্রথম প্রেম সেই আত্মীয়া প্রণয়িণীকে ঘিরে অবাধে অবিচ্ছেদে তখনও বইছিল। তারাও পূজোর সময়ে দেওঘরে আসতো আর আমিও দূর থেকে তাকে দু'চোখ ভরে দেখতুম; তার উপেক্ষা ও অবহেলার আঘাতে বসে বসে দু'চোখে ধারা ফেলতুম ও কবিতা লিখে সে দুঃখ লাঘব করতুম। আমার মাসতুত ভাই

যাকে সে ভালবেসেছিল—এই সময়ে তার হলো 'এল্‌বুমেনেরিয়া' ব্যাধি; প্রায় ৬।৭ মাস ভুগে একদিন মুখে রক্ত তুলে সে আমার চোখের সামনে মারা গেল। এই আমার প্রথম মৃত্যু দর্শন; শেষ অবস্থায় তার গায়ে মাথায় ওডিকোলন দেওয়া হয়েছিল বলে অনেক দিন অবধি ওডিকোলনের গন্ধ আমি সহ্য করতে পারতুম না। তাকে যখন দাড়োয়া নদীতে দাহ করা হলো তখন আমি সঙ্গে গিয়ে জ্বলন্ত চিতায় সেই দেহ পুড়ে ছাই হতে দেখেছিলুম। সে ভয়াবহ দৃশ্যও আমি অনেক দিন ভুলি নি।

তার মৃত্যুর সময়ে আমার প্রণয়িনী কলকেতায়। তার কয়েক মাস পরে সে যখন দেওঘরে এলো তখন আমি আমার এত দিনের ব্যর্থ প্রেমের কিছু প্রতিদান পেলুম। তখনকার প্রতিদান মানে এক আধবার লুকিয়ে হাত ধরা, একটু হাসি, চোখে নিবিড় করে দৃষ্টি বিনিময় আর পাশাপাশি বেড়ান বা গা-ঘেঁসে বসে গল্প-গাছা করা। প্রেমপত্রের বিনিময়ও অবশ্য চলতো কিন্তু সে ভীত সচকিত প্রেমের কৈশোর খেলা এর বেশি আর এগোতো না। তাকে কাছে নিয়ে প্রথম চুম্বন যখন আমাদের ঘটলো তার আগেই আমার জীবনে আর একজন মেয়ে প্রেমাস্পদ রূপে এসেছে—এসে করুণ ট্র্যাজেডির মাঝে সে প্রেম প্রতিমারও বিসর্জ্জন হয়ে গেছে। সে গল্প পরে বলছি।



বার

কৈশোর ও যৌবনের সে দিনগুলি ছিল বড় মিঠে ও সুখদ। দেওঘরে অবাধ প্রকৃতির স্নেহ-কোল, স্নিগ্ধ রঙীন প্রাণকাড়া উষা, রহস্য-নিবিড় ঘোরাল গোলাপী সন্ধ্যা, সরল আমুদে বাল্য বন্ধুগুলি, অনর্গল কবিতা চর্চ্চা, উচ্চ আশার কত স্বপ্ন, মিঠে বিরহের ও অমিলনের বেদনা-মাখা ভালবাসার খেলা—একটি ছোট গৌরী কিশোরীকে ঘিরে—এত উপকরণেও যদি জীবনটা না ভরে ওঠে তা' হলে ভরবে আর কিসে! তা' ছাড়া কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে মানুষের মন হৃদয় প্রাণ সবই থাকে সহজ, নমনীয় ও আশায় আশায় রঙীন; ব্যর্থতা, বেদনা, নৈরাশ্য, বাধা এসে এসে তখনও ঘাত প্রতিঘাতে মন-প্রাণে কড়া পড়িয়ে কঠিন করে দেয় নি, জীবনে নিরস cynicism এসে বৈরাগ্য ও উদাস নিরাশার কালো মেঘ জমায় নি।

এত সুখ আরও জমাট বাঁধতো যখন পূজোর ছুটিতে সে আসতো কাছে। তখন প্রতি সন্ধ্যায় আমুদে সুরসিক বড় মামাকে সভাপতি করে বসতো আমাদের nonsense-clubএর বৈঠক। এই বৈঠকের কড়া নিয়ম ছিল—প্রতি রাত্রের অধিবেশনে প্রত্যেক সভ্যকে একটা অন্ততঃ বেশ মজাদার রসিকতা করতে হবে, তা' না করতে পারলে সে রাত্রের মত তার নাম কাটা যাবে। এই ক্লাবে আমি ও বড় মামাই ছিলুম সব চেয়ে বড় গোপাল ভাঁড়, রামায়ণ মহাভারতের যুদ্ধে যেমন বর্ষার জলের মত আকাশ ছেয়ে বান পড়তো, আমাদের দু'জনকে তেমনি অবিরাম চালিয়ে যেতে হতো রসিকতার শরবর্ষণের ঝড়। এই নৈশ অধিবেশনে আমার ছিল সব চেয়ে বড় সুখ তার কাছটি ঘেঁসে বসা ও তার সুন্দর রক্তাধর প্রান্তে ও আকর্ণ দুটি চোখে কেবলি হাসি ফোটান। কখন কখনও সদ্য ওঠা চাঁদের আলোর নেশায় বিভোর হয়ে সে র‍্যাপারের তলায় লুকিয়ে হাত খানি দিত আমার কোলের ওপর, চোখে নিবিড় করে চোখ রেখে বুকের মাঝে তুলতো সুখের ঢেউ আর দেহে জাগাত আনন্দের অপূর্ব্ব শিহরণ।

আর একটা আনন্দের ব্যাপার ছিল সকাল ও সন্ধ্যায় বেড়াতে যাওয়া। তার সঙ্গে গাছে গাছে পাথরের গায়ে মন্দিরের দেয়ালে তারই নামের পাশটিতে ছুরি দিয়ে নিজের নামটি খুদে রাখা, তাকে পাশে নিয়ে পাথরের মাথায় বসে গান শোনা, ছবি তোলা, গল্প করা, নানা ছুতোয় ও অছিলায়

অতৃপ্ত চোখে চেয়ে চেয়ে তার রূপ-সুধা বুক ভরে পান করা— এতে আমার সকাল সন্ধ্যাগুলি রঙিয়ে কতই না উজ্জ্বল হয়ে থাকতো। দেওঘর থেকে ছুটির অবসানে সে চলে গেলে এই সবের স্মৃতি নিয়ে দেওঘরের পথ ঘাট পাহাড় পর্ব্বত নদী নালা ঘর দুয়ার আমার কাছে হয়ে থাকতো ভক্তের তীর্থস্থল; দিন কাটতো সুখ-স্মৃতিতে কেঁদে আর কবিতা লিখে। তাকে চিঠি লেখাও ছিল এক মহোচ্ছব ব্যাপার, যে দিন চিঠি দিতুম আর যে দিন তার ছোট্ট দু'দশ লাইনের উত্তরটি পেতুম সে দিন কাটতো আধজাগা স্বপ্নের ঘোরে।

বাল্য সঙ্গীদের নিয়েও সান্ধ্য ভ্রমণ ছিল কতই না সুখকর। যে দিন সখারাম বাবু সঙ্গে আসতেন সে দিন আর আমাদের পায় কে? থার্ড টিচার বকু বাবুও মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে বেড়াতে যেতেন। মাঝে মাঝে দল বেঁধে ত্রিকূট দিঘড়িয়া ও ও নন্দন পাহাড়ে excursionএ বেরোন হ'তো। আমাদের সব চেয়ে টেনেছিল শিবাজীর জীবন, কারণ সখারাম বাবু পুরাণো পুঁথিপত্র ঘেঁটে খুঁজে রাশি রাশি উপকরণ সংগ্রহ করছিলেন শিবাজীর এক বিরাট জীবনী লেখবার জন্যে, এইটিই ছিল তাঁর জীবনের সব চেয়ে বড় লক্ষ্য। তখন পর্য্যন্ত তিনি "এটা কোন্ যুগ?" বলে সামান্য একখানা চটি বই ছাড়া আর কিছু প্রকাশ করেন নি। মহারাষ্ট্র বীর শিবাজীর এত বড় গুণগ্রাহী ভক্ত আমি আর দেখি নি, সারা জীবন তিনি উপকরণই সংগ্রহ করে গেলেন, সে বৃহৎ জীবনী লিখে ওঠা আর হ'লো না।

সংবাদপত্রে এস্ ডি ও'র বিরুদ্ধে খবর লেখায় কি একটা গণ্ডগোলে তাঁকে দেওঘর স্কুলের কাজ ছেড়ে আসতে হয়, তারপর থেকেই তিনি হিতবাদীর সহ-সম্পাদক।

আমার কৈশোর ও যৌবনের উদ্বেল আশারঙীন প্রাণের অলিতে গলিতে ঘুরতো তাঁর সশস্ত্র অর্দ্ধ উলঙ্গ মাউলী সেনা নিয়ে এই দুর্ব্বার পার্ব্বত্য বীর শিবাজী। আমিও এই পতিত পরাধীন বাঙলীর রাজমহল গিরিমালায় একদিন বাঙলার রাণা প্রতাপ হয়ে ঘুরবো এই সপ্ন ছিল আমার সব চেয়ে বড় স্বপ্ন। কবিতায় শিবাজী লীলা মহাকাব্য লেখাও ছিল আর একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা। এই সময়ে আমি 'কুন্তলীন' পুরস্কারে একটি গল্প লিখে পাচ টাকা পুরস্কার পাই, গল্পটি পুরস্কার বইএ ছাপা হয়ে বেরোয়। 'সখা ও সাথী'তে ধাঁধার উত্তর দিয়ে নাম ছাপানর চেষ্টা তখন একটা বাতিকের মত আমাদের পেয়ে বসে থাকতো।

যখন দ্বিতীয় শ্রেণীতে পড়ি তখন হরিচরণ সেন দেওঘরের ছিলেন সরকারী ডাক্তার। তাঁর ছেলে সুরেন সেন, শচীন সেন এম্ এ ও বি এ পড়তেন, ছুটিতে দেওঘরে আসতেন। শৈলেন পড়তো আমার নীচের ক্লাসে, তার সঙ্গে হয় আমার রোমাণ্টিক বন্ধুত্ব। একজন আর একজনকে ছেড়ে দুদণ্ড চোখের আড় করে থাকতে পারতুম না। তার মধ্যে আমার ভালবাসাই ছিল খুব কবিত্ব ভরা ও নিঃস্বার্থ, কারণ শৈলেন ছিল বয়সে আমার অনেক ছোট ও অপরিপক্ক। কত যে চিঠি তাকে এই দু'বছর ধরে লিখেছি! বোমার মামলায় আমি ধরা পড়ার পর

তার বাবা পুলিশের উৎপাতের ভয়ে সব চিঠি পুড়িয়ে ফেলেছিলেন, শৈলেন তখন বোধ হয় বিলেতে।

আমার জীবনের সেই সব স্বপ্ন ও উচ্চাকাঙ্ক্ষার ভাগ শৈলেন নিতো না, সে ছিল নিতান্তই সাদামাঠা ছেলে, যাকে বলে ক্লাসের গুড বয়—আমুদে আপমৎলবী টাইপের ছেলে। তবু তাকে যে কি মোহের চোখে দেখেছিলুম, তার মুখ দেখে আমি আমার সব স্বদেশ হিতের ও মানব কল্যাণের ব্রত ভুলে যেতুম, মনে হ'তো একে বন্ধুরূপে আর সেই তাকে জীবন সঙ্গিনীরূপে পেলে মানুষের আর কি সুখের উপকরণ দরকার হতে পারে? জগতে বোধ হয় এই রকমটিই হয়; আমাদের মন খোঁজে এক উচ্চলোকের বৈকুণ্ঠ আর হৃদয় এবং প্রাণ খোঁজে নিতান্তই সাদামাঠা মাটির পুতুল। ফুল বিল্বপত্রে দূর থেকে পূজা করার সামগ্রী—দেবী ও অমরাবতীর সুরনর্ত্তকীতে তার পেট ভরে না, তার প্রেমক্ষুধা মেটাবার পদ্মটি ফোটা চাই তারই কামনার পাঁকে, তারই পঙ্কময় বুকের তলাটি আঁকড়ে। এ ব্যাপার আমি আরও বহু বড় বড় মনীষী ও বিরাট পুরুষের জীবনে দেখেছি। নারীত্বের মহান্ ও অপূর্ব্ব আদর্শ নিয়ে জীবনের সঙ্গিনী খুঁজতে খুঁজতে যাকে তাঁরা বরণ করে নিলেন সে মেয়ে হয়তো হাবা, সরল ও নিতান্তই সাধারণ মানুষের থাকে!

আসলে cupid is blind—একথা খুবই খাঁটি। আমাদের হৃদয় ও প্রাণের খেলা অন্ধ, সে হচ্ছে অন্ধ ক্ষুধার রাজ্য, মনের যুক্তি—বুদ্ধির আলো তাকে আলো দিতে বা সব সময় চালাতে

পারে না। আমাদের প্রাণ ভোগের বস্তু রূপে চায় ঠিক আমাদেরই মত মাটির মানুষ—দোষে গুণে অপূর্ণতায় মহত্ত্বে সুন্দর human মানুষ; খুঁৎগুলিই তার যেন আমাদের প্রেমের অন্ধ চোখে সব চেয়ে হয় টানের জিনিস। শিশুর টলমলে চলার মত, আধ আধ ভাষার মত, অর্থহীন হাত পা নাড়ার মত প্রেমাস্পদের ভ্রম ত্রুটিই তাকে সযত্ন সাদরে বুকে তুলে নেবার প্রেরণা দেয়। দেবতা নিয়ে মন আদর্শের রঙীন ফানুস ওড়ায়, প্রাণ তাকে শুধু পূজা করেই সুখ পায় না, ভরে ওঠে না। সে যে চায় আত্মসাৎ করতে, আপন করতে, একেবারে একাঙ্গ ও একাত্ম হতে!

ছেলে বেলায় দেওঘরের এই স্কুল জীবনে আমার মধ্যে প্রথম নৈতিক পঙ্কিলতা ঢোকে। কুসঙ্গে মিশে অস্বাভাবিক ভাবে শক্তি ক্ষয় করার অভ্যাস আমার হয়েছিল। এই সময়টা আমার জীবনে পাশাপাশি বইছিল পঙ্কিল ও নির্ম্মল জল। অশ্বিনীবাবুর ভক্তিযোগ পড়ে আমি এত উৎকট নীতিবাগীশ হয়েছিলুম যে মেয়ে লোকের পা ছাড়া মুখের দিকে চোখ তুলে দেখতুম না। কাম চেষ্টা দমন করবার জন্যে নাম জপ, সংখ্যা গণনা, জোরে জোরে হাত পা নাড়া, এমনি কত কাণ্ডই করতুম। কিছুতেই কাম বৃত্তি ঘুচতো না। কবিতার উচ্চ ভাব, প্রেম ভগবদ্ভক্তি এবং অধোলোকের কামবৃত্তি পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি পরম আত্মীয়ের মত চলতো। মানুষের জীবনে তাই-ই হয়,—দুধের, নির্ম্মল জলের ও পাঁকের ত্রিবেণী ধারাই

সারাটা জীবন জুড়ে কোন্ এক সাগরসঙ্গমে অবাধে পাশাপাশি বয়ে চলে; সেখানে পাঁকের মানুষ, স্বর্গের দেবতা ও ভাবের কবি একসঙ্গে ঘরকরণা চালায় কেমন করে তা' তারাই জানে।

আমার মাসতুত ভাই হুপোদা' বা অবিনাশ এত উৎকট ভাবে নিত্য কামচেষ্টা করতো যে তার albumeneria ব্যাধির সূত্রপাৎ হলো। শয্যাশায়ী হবার আগে পর্য্যন্ত তাকে দেখেছি সেই করাল ব্যাধির গ্রাসেও বীর্য্য নষ্ট করতে। তার অকাল মৃত্যুতে পরিণাম ভয়ে আমার পঙ্কবাহিনী একটু ক্ষীণস্রোতা হলেন বটে কিন্তু ঐ পর্য্যন্ত। অনেক বার দেখেছি প্রেমের চিন্তা ও গাঢ় উচ্চ অনুভূতির বা আনন্দের ফল রাত্রে নিদ্রায় দাঁড়িয়েছে স্বপ্ন-দোষে; যে দিন ভগবদ্ভক্তিতে চোখে জল এসেছে সেই দিন রাত্রেই কুস্বপ্নে সমস্ত সত্তা মলিন করে তুলেছে। জীব-ধর্ম্মই এই, উর্দ্ধস্তরে যা নিষ্কাম নিরপেক্ষ প্রেম প্রাণস্তরে তাই রূপান্তরিত হয় সময়সাপেক্ষ আসঙ্গলিপ্সায় ও দেহে এসে সেই রসই নিছক দৈহিক কামক্ষুধায় পরিণত হয়!

নীতিবাগীশতার তাড়নায় আমরা যতই কাম থেকে সরে থাকতে চাই ততই সে মানুষকে তেড়ে ধরে। ভয় এক রকম ধ্যান বা এক প্রত্যয়ধারা; যাকে ভয় করি—এড়িয়ে চলি তাকে সর্ব্বদা স্মৃতিতে জাগিয়ে রাখি, আকর্ষণ ও ত্যাগ—কামনা ও ত্যাগেচ্ছা একই বস্তুর দুটো দিক। যে সহজ হতে পারে কাউকে টানে না বা ছাড়ে না সেই জয় করতে পারে এই সব মানবী বৃত্তিকে; সমতাই আত্ম জয়ের পথ। যখন আমি আলিপুর

জেলে বন্দী তখন শ্রীঅরবিন্দ প্রথম আমায় এই সাম্যের কথা বোঝান, তখন থেকে আজ অবধি কিন্তু এই সাম্যে আমার সিদ্ধি এলো না। যোগীর কাছে সবই একই আনন্দের খেলা—এই বৃহৎ শান্ত সমতার চোখে কামকে আজও ঠিক দেখতে পারি নি, তাই সেও আজও একেবারে আমার পিছু ছাড়েনি। এই ঐশী শক্তি জীব-জগতের সর্ব্বত্র মানুষ থেকে কীট পতঙ্গের অবধি কেশাকর্ষণ করে ভোগ করাচ্ছে, নইলে জীব জগৎ চলে না, সব species গুলি ধ্বংস হয়ে যায়। তাই ভাগবত কৃপা বিনা মহামায়ার এই দুর্ব্বার শক্তির হাত থেকে মুক্তি কারুর নেই।

তের

দেওঘর স্কুল থেকে আমি প্রবেশিকা পরীক্ষা দিই ভাগলপুরে গিয়ে। এর মাঝে একবার মাত্র কলকেতায় এসেছিলুম, সেটা বোধ হয় তৃতীয় শ্রেণীতে কি চতুর্থ শ্রেণীতে পড়ার সময়ে। নরেন্দ্র এণ্ড মেওর বাড়ী গিয়ে তাদেরই একজন সাহেব ডাক্তারকে দিয়ে চক্ষু পরীক্ষা করিয়ে দু'জোড়া চশমার অর্ডার দিয়ে আমি দেওঘর ফিরে এলুম; কারণ খুলনার সেই টাইফয়েড জর ভোগের পর থেকে আস্তে আস্তে চোখ আমার খারাপ হয়েই চলেছিল, ক্লাসের পড়ায় দূরের বোর্ডে লেখা কিছুই স্পষ্ট দেখতে পেতুম না। ডাক্তার চশমা দিল—১'৫ নম্বরের একটা, আর কিছু কম নম্বরের আর একটা। যে দিন প্রথম চশমা এলো, চশমা পরে ছেলেদের মধ্যে প্রথম বসার সুখ আমার এখনও মনে আছে, আমি যেন হঠাৎ বি-এ কি এম-এ পাশ করে একটা কেও-

কেটা হয়ে পড়েছি—সবার চোখই আমার দিকে, ছাত্রসমাজে আমার দাম ও ওজন যেন জ্বরের পারার মত হঠাৎ ১০৪° ডিগ্রি উঠে গেছে। নিজের দিকে অপর দশজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করার লোভ মানুষের বুড়া বয়স অবধি থেকে যায়; এই লোভের বশেই তার অর্থ চাই, যশ চাই, প্রতিষ্ঠা চাই, কুলগৌরব চাই, এমন একটা বিশেষ বা অসাধারণ কিছু চাই যা' আর দশ জনের নেই এবং নেই' বলেই তাদের ঈর্ষা ও ঔৎসুক্য জাগায়। মানুষ সারা জীবনই নট, ফুটলাইটের সামনে লুব্ধ জনতার চোখের ওপর সারা জীবনই সে অভিনয় করে চলেছে,—নয় ট্রাজেডি, নয় কমেডি আর নয় প্রহসন।

পরীক্ষার জন্য ভাগলপুরে যাওয়াই আমার এক রকম প্রথম একা বিদেশে যাওয়া বলতে হবে। বাবার মৃত্যুর পর এই আমার প্রথম কাকার বাড়ী গিয়ে ওঠা, তখন কাকা বেঁচে নেই, ভাগলপুরের বাড়ীতে কাকীমা আছেন আর একজন অবিবাহিতা খুড়তুত বোন্ আছেন। আমার মধ্যে কি একটা আকর্ষণী শক্তি ছিল, প্রথম দেখায়ই অনেককে টানতুম। পরীক্ষা দিতে গিয়ে ছুটির সময় একা একা ঘুরে বেড়াচ্ছি, একটি ছেলে এসে গায়ে পড়ে আলাপ করলো। পরীক্ষার সেই কয়েকদিনে সে আমার একান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু হয়ে পড়লো, ছায়ার মত আমার পিছু পিছু ঘুরতো। পরীক্ষাও হয়ে গেল আর তারও হঠাৎ কি যেন ব্যারাম হয়ে মৃত্যু ঘটলো। যে দিন রাত্রে মরণ তার শিয়রে, ঠিক সেই রাত্রে সেই সময়টিতে কাকার বাড়ীর দরজার কড়া নেড়ে নেড়ে

তারই গলায় কে আমায় ডাকছিল। আমার খুড়তুত বোন্ নির্ম্মলাদি' গিয়ে দরজা খুলে দেখলো কেউ কোথাও নেই, তার কয়েক মিনিট পরেই খবর এলো সে আমার নাম করতে করতে আমার সঙ্গে দেখা করার জন্য নিতান্তই অস্থির অবস্থায় মারা গেছে।

পরীক্ষার ফল বের হলে দেখা গেল আমি দ্বিতীয় ডিভিশনে পাশ করেছি। তখন এফ্ এ বা ফাষ্ট আর্টস্ পড়তে গেলুম পাটনায়, সেখানে বিধান বোর্ডিংএ বাসা নিয়ে পাটনা কলেজে গিয়ে ভর্ত্তি হলুম। এর ঠিক আগেই মেজদা মনোমোহন ঘোষ সেখানকার ইংরাজীর প্রফেসর ছিলেন, সবে বদলী হয়ে তখন ঢাকা কলেজে গিয়েছেন। প্রসিদ্ধ এম ঘোষের ভাই বলে ছাত্র-মহলে আমার আসায় খুব একটা চাপা চাঞ্চল্যের ঝড় বয়ে চলেছে বলে বুঝতে পারলুম কিন্তু ভাব আমার বড় একটা কারু সঙ্গেই হ'লো না। একা কলেজে যেতুম, একা ফিরে আসতুম্। বোর্ডিংএ গণেশ বাবু ছিলেন আচার্য্য ও অধ্যক্ষ, প্রতি সন্ধ্যায় ও সকালে সেখানে ছেলেদের নিয়ে হ'ত উপাসনা। আমি তখন কবিতা লিখতুম ও গম্ভীর বিষয় সব নিয়ে সাহিত্যিকদের মত আলোচনা করতুম। উপাসনার নিয়ম ছিল এক এক দিন এক একজন ছেলে আচার্য্যের গদীতে বসে প্রার্থনা করবে। গণেশ বাবু আমাকে প্রার্থনা করবার জন্যে অনুরোধ উপরোধ আরম্ভ করলেন এবং আমার অনিচ্ছা দেখে একদিন উপাসনান্তে হঠাৎ সবার সামনে উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করে দিলেন—"এইবার বারীন্দ্র

কুমার প্রার্থনা করবেন”। আমি কবিত্বময় রাবীন্দ্রিক ভাষায় গদগদ কণ্ঠে এক বক্তৃতা পরম পিতার নিরাকার কর্ণের উদ্দেশ্য ছেড়ে দিয়ে ছেলেদের মধ্যে এক পরম বিস্ময়ের বস্তু হয়ে উঠলুম। প্রার্থনা কিন্তু সে দিনের পর আর আমি করলুম না, এ রকম প্রার্থনা করার সমীচীনতা নিয়ে গণেশ বাবুর সঙ্গে আমার খুব এক চোট তর্ক হয়ে গেল। ভগবান যদি সর্ব্বজ্ঞই হন তা হলে তিনি পিঁপড়াটিরও মনের কথা টের পান ; বক্তৃতা দিয়ে জগতের পরম শিল্পীকে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ দেবার বা অনুরোধ জানাবার কোন আবশ্যকতা থাকে না। আর ভগবৎ সাক্ষাৎ-কার যে করে নি তার পক্ষে ভগবানের সম্বন্ধে পঞ্চমুখ হয়ে বক্তা কতখানি হাস্যকর ব্যাপার। এই সব নিয়ে নিরীহ গণেশ বাবুকে আমি কিছুক্ষণ অতিষ্ঠ করে তোলায় তিনি প্রতিশ্রুতি দিয়ে বাঁচলেন যে আর আমায় প্রার্থনা করতে অনুরোধ করা হবে না। সুতরাং সেই থেকে নিরাকার পরব্রহ্মও রক্ষা পেলেন, আমিও বাঁচলুম।

পাটনা কলেজে তখন প্রথম বার্ষিক শ্রেণীতে আমার সঙ্গে একটি ছেলে পড়তো, তার নাম ছিল বঙ্কিম। তাকে আমার খুবই ভালো লাগতো, তবু তার সঙ্গে প্রাণ খুলে মিশতে আমি পারি নি। ক্লাসের ছেলেরা আমার অমিশুক ভাব দেখে আমাকে অহঙ্কারী ঠাউরে নিয়েছিল, পরস্পরের মধ্যে নাকি জল্পনা আলোচনায় ঠিক হয়েছিল, যে, আমার গলায় ছেঁড়া জুতোর মালা পরিয়ে দেওয়া হবে। কাজে কিন্তু তা হয়ে ওঠেনি।

একদিন কলেজ থেকে বিধান বোর্ডিংএ ফিরছি, একদল ছেলে আমার কাছাকাছি এসে অন্যদিকে চেয়ে বলতে বলতে চললো, "অ নবাব, নবাব, অ খাঞ্জা খাঁ।" আমি নির্ব্বিকার! পরম গম্ভীর ও নির্লিপ্ত ভাবে মা ধরিত্রীর বক্ষে দৃষ্টি নিবদ্ধ করে চলেছি, আমাকে ঘাঁটায় কার বাপের সাধ্যি।

পাটনা কলেজে পড়েছিলুম বোধ হয় ছয় মাস। তারপর গ্রীষ্মের ছুটিতে দেওঘরে দিদিমার কাছে এসে যখন আছি তখন সস্ত্রীক মেজদা ঢাকা থেকে প্রথম দেওঘরে এলেন। আগেই বলেছি দাদা বাবু (আমার মাতামহ) রাজনারায়ণ বাবু অসবর্ণ বিয়ের বিরোধী ছিলেন বলে মেজদার মুখ দেখবেন না বলে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, তাই তিনি বেঁচে থাকতে আর মেজবৌদিকে আমার দেখা হয় নি। ভাল কথা, দাদা বাবুর অসুখ ও মৃত্যুর কথা এখনও বলা হয়নি, প্রসঙ্গক্রমে যখন কথাটা এসেই পড়লো তখন সেটাও এইখানে বলে নিই। বোধ হয় আমি ফার্ষ্ট ক্লাসে পড়বার সময় এ ঘটনাটা ঘটে।

একদিন সকালে বেড়িয়ে ফিরে এসে দাদা বাবুর হঠাৎ এপো-প্লেক্সি হ'লো, তখনই অর্দ্ধ অঙ্গ তাঁর পক্ষাঘাতে পড়ে গেল। কত ডাক্তার বৈদ্য হোমিওপ্যাথি চিকিৎসা করানো হ'লো, সে অবশ অঙ্গ কিন্তু আর বশে এসে সচল হ'লো না। বিছানায় শুয়ে শুয়ে বাহ্যে প্রস্রাব করতেন, শোয়া অবস্থায়ই খাইয়েও তাঁকে দিতে হ'তো। আমার ওপর ছিল তাঁর সেবার ভার। আমার এই অক্লান্ত সেবা দেখে হেডমাষ্টার যোগীন বাবু

এত মুগ্ধ হয়েছিলেন যে, দাদাবাবুর কাছে প্রস্তাবই করে বসলেন তাঁর মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবেন। দাদাবাবু, বড় মামা সবাই হেসে তো গড়াগড়ি, যোগীন বাবুর আগ্রহ দেখে বললেন, "বারীন তো স্বাধীন, সে করতে চায় করুক না।" মেয়ে বেচারী ছিল কালো আর আমি ছিলুম রূপের উপাসক কবি। খুব জোরে মাথায় একটা ঝাঁকি দিয়ে অসম্মতি জানিয়ে আমি প্রজাপতি দেবতাকে সে যাত্রা রম্ভা দেখিয়ে বাঁচলুম বটে কিন্তু এর পর থেকে সে মেয়ে আমাদের বাড়ীতে বেড়াতে এলে আত্মীয়াদের ঠাট্টার চোটে আমার বাড়ী ছাড়তে হ'তো। বিয়ের কথায় কিন্তু কেমন একটা গোপন সুখও হতো আবার অনিচ্ছাও আসতো, রামচরণ বাবুদের বাড়ী কারু বিয়ের সানাই বাজলে চাঁদনী রাতের বুকে সে সুর কি উদাস মায়াই যে জাগাত তা' আমার খাঁ খাঁ করা শূন্য বুকটাই কেবল জানতো ও বুঝতো। আশ্চর্য্য, এই বিয়ে বস্তুটা আমি চিরটা কাল চেয়েছি কিন্তু কখনও করি নি, যত রম্ভা তিলোত্তমারা আমার জীবনে এসে ঢুকেছেন ছানলাতলা মাড়িয়ে সোজা পথে নয় কিন্তু 'দেয়া, বিজুরী' ও কাঁটা বনের বাঁকা গহন পথে। নারী আমায় ভালবেসেছে চিরদিনই লুকিয়ে—শাস্ত্র ডিঙিয়ে, লোকাচারের পাঁচিল টপ্‌কে, অবৈধতার চোর-দরজা খুলে, খিড়কীর পথে ; তাই সুন্দরীদের চরম দান আমার ভাগ্যে জুটতে এতখানি দেরী ঘটে গিয়েছিল।

দাদাবাবুর রোগ প্রথমে এলোপ্যাথিতে সারাবার ব্যর্থ চেষ্টা চললো, তারপরে ভার নিলেন কবিরাজ বিজয়রত্ন সেন ; ইনি

আমাদের পারিবারিক চিকিৎসক ছিলেন। সবাই বললেন আর একটা এপোপ্লেক্সির ধাক্কা এলে ইনি আর বাঁচবেন না। শেষে ধাক্কা যখন সত্যি সত্যিই এলো তখন মহেন্দ্রলাল সরকার হোমিওপ্যাথিতে দাদাবাবুর চিকিৎসা করছেন। হঠাৎ একদিন দেখি দাদাবাবুর বুক থেকে কি রকম ঘড় ঘড় ঘড় ঘড় শব্দ হচ্ছে আর মুখটা মাঝে মাঝে হাঁ হয়ে যাচ্ছে। ন-মেশোকে বলায় (কৃষ্ণকুমার মিত্র) তিনি দাদাবাবুর বিছানার কাছে এসে ছেলে মানুষের মত কাঁদতে লাগলেন, বড়মামাকে বাড়ীর মধ্যে খবর দেওয়ায় মেয়ে মহলে মড়া কান্নার রোল উঠলো। এই অবস্থায় কয়েক ঘণ্টা থেকে দাদাবাবু মারা গেলেন, আমি সারা রাত সেই ঘরে শুয়ে তাঁর মৃতদেহ আগলে রইলুম। পরদিন সকালে সবাই মিলে দাড়োয়া নদীর বুকে বালুচরে নিয়ে গিয়ে তাঁকে দাহ করা হ'লো। মৃত্যু দেবতা এই দ্বিতীয়বার আমার জীবনে এসে গুরুগম্ভীর পদে উঠান পার হয়ে গেলেন। এখন কবে যে উপরের ছাড়পত্র নিয়ে আমাকেই ডাকতে এসে হাজির হন বলা যায় না।

মেজবৌদির আমাকে দেখে এত ভাল লাগলো যে মেজদা'কে বলে আমাকে একরকম অনিচ্ছাসত্ত্বেও গ্রেপ্তার করে ঢাকা নিয়ে চললেন। এই আমার পূর্ববঙ্গের সঙ্গে প্রথম পরিচয়। ঢাকায় মেজদা'র বাড়ী ছিল কলেজেরই কাছে, ইংরাজী ধরণের বাঙলো প্যাটার্ণের বাড়ীখানি। সামনে গেট দিয়ে ঢুকে একটি মাঠ —সবুজ ঘাসে ঢাকা lawn, তার পরেই দু' তিন ধাপ উঠে



মেজদাদা স্বর্গীয় মনোমোহন ঘোষ ও তাঁহার কন্যাদ্বয়—

(১) দাঁড়াইয়া আছেন প্রথমা কন্যা শ্রীমতী মৃণালিনী

(২) দ্বিতীয়া কন্যা শ্রীমতী লতিকা বসু বসিয়া আছেন।

বারাণ্ডা। ঘর এ-পাশে দু'খানি ও-পাশে দু'খানি এবং মাঝে হলের মত লম্বা ধরণের আরও দু'খানি। একটি ঘরে মেজদা শুতেন ও তাঁর রাশি রাশি বইএর মাঝে ডুবে থাকতেন কবিতার রস মাধুর্য্যে। বাইরের হলটি ছিল ড্রয়িং রুম, ভিতরেরটি ছিল বৌদির শোবার ঘর। এ পাশের মাঠের দিকের প্রথম ঘরটি ছিল আমার আর তার ভিতর দিকেরটি ছিল খাবার ঘর—dining room ; ভিতর দিকে সারি সারি খোলার ঘরে ছিল বাথ রুম, রান্নাঘর ও ভাঁড়ার ঘর। ঢাকায় এসে আমার জীবনের অন্তঃপুরে ঢুকলেন তাঁর অনবদ্য লাবণ্যে যৌবন-কান্তিতে চারিদিক আলো করে আর একটি মেয়ে। তারও নাম ধাম বলার উপায় নেই

ঢাকা কলেজে ভর্ত্তি হয়ে আমার ভাব হলো সুসংএর ছোট তরফের ছেলে সুরেশ চন্দ্র সিংহের সঙ্গে। শুনেছি এখন সে ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট না ঐ রকম কি। তখন সে ছিল নারীর অধিক কোমল কবিপ্রকৃতির লাজুক ছেলে। আমার ও তার কবিতা লেখার বাই ছিল বলে ভাবটা হ'লো খুবই গাঢ় রকমের। সকালে বাড়ীতে কবিতা লেখা, দুপুরে কলেজ করা, বিকেলে সুরেশের সঙ্গে রমনার মাঠে বেড়াতে যাওয়া, রাত্রে গিয়ে সেই মেয়েটিকে পড়ানো—এই হলো আমার সারা দিনের কাজ। মেয়েটি ছিল তন্বী, কিশোরী, নাতিদীর্ঘ, বিপুলকুন্তলা, সত্য সত্যই হরিণনেত্রা যাকে বলে। রং ছিল তার গায়ের ঠিক দুধে আলতায়, চোখ দুটিতে কি যে অতল কালো গভীরতার ডাক

ছিল তা' বলে শেষ করা যায় না—সেই গভীর কালো চোখের পাতা দুটি উঠলে সারা প্রাণখানা আঁটু পাটু করে তার দিকে ছুটে যেতে চাইতো। ভ্রূ দু'টি তার ছিল কি অপূর্ব্ব রেখায় যে টানা, অমন আরক্ত টুকটুকে রাঙা প্রবাল-নিবিড় ঠোঁট দু'টির শোভা কিন্তু নষ্ট করে দিয়েছিল সামনের উঁচু দু'টি দাঁতে; তবে মুখ বুজে থাকলে সে দোষ বড় একটা দেখা যেত না।

পড়া নিতে এসে আমার কাঁধের ওপর ঝুঁকে পড়ে সুগন্ধী চুলের পরশ দিয়ে সে আমার সর্ব্বনাশটা করলো, মাথাটা ঘুরে যাবার যেটুকু বাকী ছিল তা শেষ করে দিল তার ঐ ভুবনবিজয়ী চোখের আড়ে আড়ে সলাজ সত্রাস চাহনি। বাস! সেই থেকে আমাদের দু'জনার সর্ব্বনাশ হয়ে গেল। তার পর থেকে ছয় মাস ধরে চললো দু'টি তৃষিত প্রেমার্দ্র দেহ প্রাণ মনের পরস্পরের ওপর ব্যাকুল হয়ে আছাড়ি পিছাড়ি। অবাধ প্রচুর অবসর, ভোগ করলেই হয়, তবু আমাদের কিসে যেন আটকাতে লাগল—দেহ সম্ভোগ হলো না, হলো শুধু দেহের বেলাভূমি ঘিরে দু'জনকে ছুঁয়ে বুকে নিয়ে প্রেমের পাগল ঢেউ তোলা। কি স্বপ্নের যে ঘুমঘোরে আচ্ছন্ন হয়ে এই মাসগুলি কেটেছিল।

তার মুখে শুনেছিলুম তার বিবাহিত জীবনের গোড়াটা ছিল ভারি দুঃখের। স্বামী পছন্দ করেও শেষটা বিয়ে করেন নি—তাঁকে একরকম জোর করেই মেয়ে গছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। স্পষ্ট করেই রাগের মাথায় তিনি বলতেন 'নাক

তোমার ছোট আর দাঁত বড় উঁচু।' তার পরে কিন্তু স্ত্রীকে খুবই ভাল বেসেছিল, তখন কিন্তু সে বেচারী হৃদয়টি তার আমাকে দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে চুকেছে। স্বামীর সঙ্গে মানিয়ে তাঁকে ভালবেসে শ্রদ্ধাভক্তি করে সংসার ঘর গৃহস্থালী করা ছাড়া তার তখন আর কিই বা করবার শক্তি আছে, স্বামীর প্রণয়িনী হবার সাধ্য তার যে আমিই নিয়েছি হরণ করে। তার প্রকৃতিটি ছিল কোমল, নমনীয়, ভীরু, নিতান্তই মেয়েলী। স্বামীর প্রতি এই ধারণা তাকে কাঁটার মত বিঁধতো, নিজেকে আমার পায়ে ঢেলে দিয়ে ভাল না বেসেও তার উপায় ছিল না আর স্বামীকে গোপন করার লজ্জা ও অপরাধের বোঝা হাসি মুখে বইবারও তার সামর্থ্য ছিল না। এ রকম দোটানার কি যে নিদারুণ আঘাত তা কেবল শশকের মত কারণে অকারণে ভীত দুর্ব্বলচিত্ত নারীই জানে। স্নায়ু তার লক্ষ্যের অগোচরে দোটানার বেদনায় ও টানাপোড়েনের ধাক্কায় ধাক্কায় দিন দিন এলিয়ে পড়তে থাকে। তারপর যখন হঠাৎ সব ফুরিয়ে যায়, বিধাতার চরম আঘাত এসে দয়িতকে ছিনিয়ে নিয়ে সব সাঙ্গ করে দিয়ে যায় তখন এক দিন তার প্রাণ মন স্নায়ু পেশী সব হঠাৎ জবাব দিয়ে বসে, যন্ত্র বিকল হয়।

আমার ঢাকায় আসার দু এক মাস পরেই বোধ হয় এক দিন হঠাৎ তার ঘন ঘন বমি হতে লাগল, মাথা ঘুরে শরীর কেমন করতে আরম্ভ করলো। সে বাড়ীতে একজন বুড়ী মুসলমানী রাঁধুনী ছিল, সে মিটি মিটি হাসছে দেখে আমি অবাক হয়ে

জিজ্ঞেস করলুম, "হাস্‌ছিস যে? বেচারীর অসুখ করেছে আর তুই কিনা হাসছিস্!" রাঁধুনী চোখ টিপে আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললো, "অসুখ কোথা? তুমি যেমন হাবা মনিষ্যি, দিদিমণির খোকা হবে গো, খোকা হবে।" শুনে হঠাৎ আমার ভিতরটা কি যেন আঘাত পেয়ে গুটিয়ে কুঁকড়ে গেল, ব্যথায় মনটা মূক হয়ে রইল। যে এমন ভাবে সর্ব্বস্ব ঢেলে নিবিড় প্রেমে আমার হয়েছে তার গর্ভে আর এক জনের সন্তান! এ যেন আমি কিছুতেই সইতে পারছি নে, অথচ আমি বেশ জানি তার স্বামী আছে, এই কোমল ভীরু অসহায় নারী সেই গুরু গম্ভীর স্বামীরই কথায় ওঠে বসে।

তার পরদিন যখন তার দেখা পেলুম তখন তাকে যেমন রোগা ও ক্লান্ত তেমনি সুন্দর দেখাচ্ছিল। ক্ষয়িতকলা চাঁদের মত উজ্জল তার রূপ ব্যথাতুর লাবণ্যে যেন গলে পড়ছে। করুণায় আমার বুকখানা দুলে উঠলো, চোখে উছলে উঠলো আকুল আত্মহারা প্রেম; সেও আমার দিকে চেয়ে অসহায় শিশুর হাত বাড়িয়ে কোলে আসবার মত করে হাসিটুকু হাসলো। তখন সামনে তার স্বামী, কিছু বলবার উপায় নেই। এই ভালবাসা আমাদের এক বছর চলেছিল। তার কোলে একটি ফুটন্ত পদ্মের মত মেয়ে এলো, সেই অনবদ্যা কিশোরী হলো মা! তারপর আমাদের প্রেম সকল বাঁধ ভেঙ্গে চললো অনিবার্য্য গতিতে সব কুইয়ে ফেলবার—সব কেড়ে নিবার দিকে; একদিন গভীর রাত্রে কামনার বশে অসহায় হয়ে আমরা দেহ

ভোয়ের খুব কাছাকাছি গিয়ে কোন গতিকে আত্মরক্ষা করলুম। আমিও বুঝলুম আর সেও বুঝলো এরকম করে আর বেশী দিন চলবে না, সংযমের বাঁধ আমাদের ভেঙে পড়ছে।

তখন আমার এলো পরিণাম চিন্তা! তাইতো, এত অসহায় যে, এমন ভীরু ও দুর্ব্বল যে তার সুখের নির্ব্বিঘ্ন সংসার নীড়টুকু নষ্ট করে দেব? এক দিন না একদিন গোপন সম্বন্ধটুকু আমাদের ধরা পড়বেই পড়বে, তখন বেচারী সে লজ্জার আঘাত কি সইতে পারবে? আমি দু দিন ধরে তাকে বুঝিয়ে ঢাকা ত্যাগ করলুম, চক্ষের জলে বুক ভাসাতে ভাসাতে সে গাড়ী করে আমায় ট্রেণে তুলে দিয়ে গেল। কলকেতায় এসে তার প্রেম-ভিক্ষায় ভরা ২।৩ খানি চিঠি পেয়েছিলুম। তারপর তারই হাতের লেখা স্বাক্ষরহীন একখানি চিঠি এক দিন এলো, তাতে সে লিখেছে, "আমি আর এ দোটানা সইতে না পেরে ওঁকে সব বলেছি। আমায় আর চিঠি লিখো না, আমার দুর্ব্বলতার অপরাধ ক্ষমা করো। তোমার অভাগিনী—।" পরে শুনলুম সে পাগল হয়ে গেছে! দশ বারো বছর সে বেঁচে ছিল পাগল ও রুগ্ন অবস্থায়। আজ কয়েক বছর হ'লো সে সকল জ্বালার বোঝা নামিয়ে দিয়ে রূপের ও লাবণ্যের কোন অলক্ষ্য জগতে চলে গেছে—আমার প্রতি তার সে প্রেম ও স্মৃতির বোঝাও হয়তো এপারেই ফেলে দিয়ে। আরও একবার তাকে দেখেছিলুম, সে কথা পরে বলছি।

চোদ্দ

ঢাকার জীবনের আরও কত কিছ বলবার আছে। আমার ঘূর্ণাবর্ত্তে চির-আকুল এই জীবনে নির্ব্বিঘ্ন শান্তি এসেছে কিন্তু টেকে নি; আশায় রঙীন অরুণ-রক্ত উষা কতবারই যে পূর্ব্বাচলের কোল জুড়ে নববধূর ব্রীড়ামুখে উদয় হয়েছেন আর আমি ভেবেছি ভবঘুরে বুঝি এতদিনে ঘর বাঁধলো। কত সাধ, কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষার রঙীন ফানুস! ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে নীড় রচনার সুখে ব্যাকুল পাখীর কতই না তৃণ সঞ্চয়, খুঁজে খুঁজে সোণার তার, রূপার জালতি, লতার তন্তু এনে এনে তার কূজন-চঞ্চল অরুণ-আঁখি সঙ্গিনীটিকে জুগিয়ে যাওয়া। কোন্ অজানা বনের কোল থেকে, এই চির অপরিচিত অথচ আজ সবার চেয়ে পরিচিত সবার চেয়ে অন্তরতম পাখীটি হঠাৎ এসে তার জীবন ভরে ফেলেছে বলেই না ঘরছাড়ার ঘর গড়বার এত সাধ।

নীড় বাঁধার সব অক্লান্ত আয়োজন ফুরোতে না ফুরোতেই কিন্তু ঝড় ওঠে, সঙ্গিনী মাথায় আঘাত পেয়ে চোখের সামনেই রক্তমাখা পাখা মেলে লুটিয়ে পড়ে আর আকাশ ফাটিয়ে ডাকতে ডাকতে এক দিকে উড়ে যাওয়া ছাড়া সাথীহীন পাখীর আর গতি থাকে না। তবু কিন্তু তবু ঐ ক্ষণিক সুখ-নিবিড় আয়োজন টুকুর জন্যে শুধু কিই বা না দেওয়া যায়! মেজদা'র নিরিবিলি বাড়ীতে আমার পড়ার ঘরটি ছিল বড়ই শান্তরসের জায়গা। এক পাশে কবিতা ও নভেলে ভরা, খাতা পেন্সিল কলমে এলো-মেলো অগোছাল টেবিল, তারই ওপাশে ক্যাম্প খাটখানা—যার ওপর বিছনা দিন রাত পাতাই থাকতো। ঘরটির সামনে ঘাসে সবুজ একটি ছোট্ট মাঠ, তার পরই বাড়ীর কম্পাউণ্ডের গেট। আমার মেজবৌদির শ্রীহস্তটির স্পর্শে গোছাল এই ছোট সংসারে কোথায়ও এতটুকু অশান্তির ছায়াও ছিল না। আমার কবিতা রসাস্বাদনের তিনি ছিলেন মুগ্ধ মূক শ্রোতা; মনে আছে এই সময়ে রবীন্দ্রনাথ, মানকুমারী, প্রিয়ম্বদা, দেবেন্দ্রনাথ আদি কবির অনুমতি নিয়ে আমি আর বউদি' একটি কবিতা সংগ্রহ ছাপাবার আয়োজন প্রায় সম্পূর্ণ করে তুলেছিলুম। তারপর কেন যে তা' ছাপানো হ'লো না তা' এখন আর মনে নেই, বোধ হয় টাকার অভাবেই হবে।

কৃষির স্বপ্ন এই সময়ে আমায় পেয়ে বসেছিল। জীবনের সব চেয়ে বড় স্বপ্ন ছিল—বাঙলার কোন্ নিরালা বনহরিত কোণে আমার হবে বেড়ায় ঘেরা, লাউলতায় কলার ঝোপে ঢাকা

সবজীবাগ ও খড়ে ছাওয়া কুটীর খানি। ফুলের কেয়ারী বাঁধা পথ গেছে চার দিক থেকে ঐ কুটীরেরই গোবর-লেপা আঙিনায়, গোশালা, ধানের মরাই, বাসীপুকুর, চণ্ডীমণ্ডপ তাকে করে রেখেছে বাঙলার পল্লীর নয়ন-মঞ্জুল নিখুঁত ছবি। এইখানে জীবনের মধ্যাহ্ন ভাবমগ্ন কবির চোখের কাছে এসে একদিন উদয় হবে আমার হারিয়ে ফেলা সেই দয়িত। সে যে কে, সেই কৈশোরের অপ্রতিদানের ব্যথার সঙ্গিনী, না, এই ঢাকার নিরালা জীবনে অতর্কিতে প্রবিষ্টা সচকিতা ভয়বিহ্বলা রূপের ডালি মেয়েটি, তা' জিজ্ঞাসা করলে হয়তো ঠিক বলতে পারতুম না, কিন্তু সে যে এই দু'জনের একজন সে বিষয়ে কোন সন্দেহই ছিল না। তখনও একজন হৃদয় অন্তঃপুরের কোন্ নিভৃত ঘরের দুয়ার ভেজিয়ে লুকিয়ে আছে আর ত্রস্ত শঙ্কিত পদে আর একজন এসে সিংহাসনটিতে লাজনম্রা রাণীর মত বসেছে। আমার মত মানুষ বোধ হয় নারীকে ভাল না বেসে পারে না, হৃদয়ের দিক দিয়ে সে ওদের সবার কাছেই সমান চির পরাজিত। প্রেমের এই অসহায় স্বৈরবৃত্তি ভাল কি মন্দ কে বলবে! এই আনন্দ-নিবিড় জগতে ওরাও এসেছে অমোঘ লক্ষ্য নিয়ে ব্রহ্মবাণ হাতে আর আমরাও ব্যাকুল হয়ে আছি ওদেরই হাতে মরবার জন্যে। জগৎ-শিল্পী যাদের দু'জনকে দু'জনের দিকে দুর্ব্বার টান দিয়ে গড়েছে, পরস্পরের চোখে মুখে সর্ব্ব অবয়বে দিয়েছে আকুল-স্পর্শের বেদনা, পুড়ে মরবার আগুন, ডুবিয়ে নেবার সর্ব্বনাশা সুখসিন্ধু, তাদের পরস্পরের কাছ থেকে বাঁচবার উপায় কি?

উপায় তো ব্যবস্থাকর্ত্তা রাখে নি, আর ট্যারা একচোখো নীতি-বাগীশই তো এই দিন দুনিয়ার উপায় ও ব্যবস্থা কর্ত্তা নয়।

সুসংএর ছোটতরফ আমায় প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন গারো পাহাড়ের কাছাকাছি কোথাও কৃষির জন্য একশ বিঘে জমি দেবেন বলে। মেজদা' বলেছিলেন, "কলকেতায় গিয়ে জোগাড় যন্ত্র কর, টাকা আমিই না হয় দেব।" কৃষির কবিতা-মাখা ছবিটি বুকে নিয়ে ট্রেণে ষ্টিমারে মাঠ ঘাট নদী নালা ডিঙিয়ে এসে পড়লুম ট্রাম ছ্যাকরার হৈ-চৈ ভরা কলকেতায়। তাকে হারাবার স্মৃতির দাহ বুকে আর এই স্বপ্ন মাথায় নিয়ে হর্ষ আর বিষাদে কেমন এক রকম অব্যবস্থিত অবস্থায় ফিরে এলুম—আবার এলুমও ঠিক সেই কৈশোরের ভালবাসার পাত্রী এতদিনে বিস্মৃতির বশে আধভোলা মেয়েটির কাছে। তার জীবনে তখন সেই মানুষ আসা যাওয়া করছে যাকে সে একদিন মালা দিয়ে বিবাহিত জীবনে বরণ করে নেবে। বোধ হয় সে আমাকে ও তাকে দু'জনের কাউকেই ভালবাসে নি, শুধু আমাদেরই ভালবাসার টানে পড়ে করুণায় গলে সাড়া না দিয়ে থাকতে পারে নি। এমনই ওরা কোমল ও অসহায়, কাকে দিতে কাকে যে সর্ব্বস্ব দিয়ে ফেলে তার ঠিক ঠিকানা হদিস পর্য্যন্ত থাকে না; শেষে হয়তো সারাটা জীবনই অনুতাপ করে জলে পুড়েই মরে।

একদিন ভোর বেলা ছাদে উঠে পূর্ব্বাকাশে উষার অরুণ রাগের স্নিগ্ধ লাজ-রক্তিমার শোভাটুকু আনমনা হয়ে চেয়ে

চেয়ে দেখছি, হঠাৎ আমার নাম ধরে কোমল নীচু গলায় কে ডাকলো। ফিরে দেখি পাশে গা-ঘেঁসে সে দাঁড়িয়ে! আমি আর থাকতে পারলুম না, তাকে কাছে টেনে নিয়ে কপালে একটি চুমো খেয়ে বললুম, "কি এত সকালে ছাদে যে?" হঠাৎ আমার বাহুর বাঁধনে তার দেহ আড়ষ্ট হয়ে উঠলো, মুখখানি ভয়ে কেমন বিবর্ণ হয়ে গেল, শঙ্কাতুর চোখ ছুটি ছাদের দরজার দিকে আশঙ্কায় বিহ্বল হয়ে রইল চেয়ে। সেই দিকে ফিরে দেখি ছাদের সিঁড়ির দরজায় তার মা মুখখানা কালো গম্ভীর করে এসে বসে আছে।

মেয়েকে নিয়ে তিনি নেমে গেলেন, বলির পশুটির মত আড়ষ্ট শঙ্কিত পায়ে সে সঙ্গে গেল। সেই দিন তুপুর বেলা সে-বাড়ী ছেড়ে যাবার সময় দেখলুম একটা অন্ধকার ঘরে খালি তক্তপোষের উপর উপুড় হয়ে পড়ে সে কাঁদছে। সেই আমাদের শেষ ছাড়াছাড়ি, অথচ কিই বা ঘটেছিল যার জন্যে মা হয়ে এত বড় শাস্তি ও গঞ্জনাটা তাকে দিল! আমরা এর আগে সেই বার তের বছরের ভালবাসায়ও কখন এতদূরও এগোই নি, তু'জনকে তুজনে প্রায় দেহসম্পর্ক শূন্য হয়ে তবু নিবিড় একাত্মতায় ভালবেসেছিলুম। অবশ্য এটা ঠিকই যে, এসব ক্ষেত্রে ভালবাসা মনের বা হৃদয়ের গণ্ডীতেই আটকে থাকে না, অবসর ও সান্নিধ্য পেলেই ক্রমে ক্রমে প্রাণে—শেষে স্নায়ুতে তরঙ্গ তোলে, পরিণামে দেহেতেও গড়িয়ে আসে। সেই সন্তানকে কলঙ্ক থেকে রক্ষা করতে আগে থেকেই মা-বাপ

হীন হয়, তাড়না করে। কিন্তু যে সমাজে মা-বাপকে স্নেহ মমতা ভুলে, মেয়ের মন-প্রাণের সাধ আকাঙ্ক্ষা ভুলে নিষ্ঠুর হতে হয়, সে সমাজ কি আদর্শ সমাজ? স্বতঃস্ফূর্ত প্রেমই তো মানুষের মিলনের আসল বস্তু? সেই প্রেমই যত কলঙ্ক নিন্দা লজ্জার কারণ? প্রেমকেই সমাজ এমন অপাঙক্তেয় করে রেখে বিবাহের অনুষ্ঠান গুলোকেই এতখানি মূল্য দেবে এইটেই কি হ'লো সুষ্ঠু সমাজ বিধি? মানুষের সুখ কি শুধু সুবিধা নিয়ে?

আমি এমন দেখেছি যে মা ও বাপ মেয়েকে ঠিক জেলারের মত নির্দ্দয় হয়ে তালা চাবি দিয়ে আটকে রেখেছে, জল্লাদের মত নিষ্ঠুর হয়ে মেরেছে, অকথ্য গালি-গালাজ করেছে; অপরাধ এই যে, মেয়ে হৃদয় দিয়ে ফেলেছে এমন জায়গায় যেখানে সামাজিক বা পারিবারিক সম্বন্ধে বাধে। এত যে আমরা কবিতায় গানে নাটকে স্তুতি করি দিব্য মাতৃস্নেহ বলে সেই মাতৃস্নেহই সামাজিক পারিবারিক বা আর্থিক স্বার্থে আঘাত পেয়ে কি পর্য্যন্ত নিষ্ঠুর ও ক্রূর হতে পারে তা' দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। শিক্ষিত ভদ্র ঘরের মা-বাপ শিক্ষিত উন্নতমনা মেয়েকে বাধা দিয়ে, তালা বন্ধ করে, গঞ্জনা দিয়ে অপমান নির্য্যাতন করে এমন অবস্থায় এনেছে দেখেছি যাতে ভাঙ্গ-ফিটের রোগ হয়েছে, মাথা খারাপ হয়ে গেছে, স্নায়বিক দুর্ব্বলতায় সে শয্যা নিয়েছে। এর পর মনের দুঃখে সে মেয়ে আত্মঘাতী হতে পারে, পাগল হতে পারে, কি না হতে

পারে? এই সব দেখে শুনে শ্রীঅরবিন্দের কথাই আমার ঠিক মনে হয়, মাতৃস্নেহ পুত্রবৎসলতা ও-সব হচ্ছে বাজে কথা, ওসব বৃত্তিই আসলে পশুবৃত্তি, দেহধর্মে আপনি আসে এবং সহজে বিকৃত হয়, কারণ ও-সবের মূলেই রয়েছে স্বার্থ—নিতান্তই হীন ব্যক্তিগত স্বার্থ। খুব উদার মহামনা মানুষ ছাড়া ঠিক নিঃস্বার্থ ভাবে এ জগতে কেউ কাউকে ভালবাসে না, মা-বাপও নয়। সচরাচর ভালবাসা স্বার্থেরই একটা স্নায়বিক রূপ। নিঃস্বার্থ প্রেম জগতে বড়ই দুর্লভ।

সংসারে পশু-মা পশু-বাপ পশু-স্বামীই বেশী—হাজার সাধু ও ভদ্রলোক সেজেই তারা থাক না কেন। সমাজের ভয়, টাকার লোভ, কুল ভাঙার আশঙ্কা, বদনামের আতঙ্ক, নিজের জিদ ও পছন্দ অপছন্দের দোহাই—যা' হোক একটা কিছু তুচ্ছ হেতুই যথেষ্ট। মানুষ তার মোহে ও বশে সব ভুলে যায়, চিরজীবনের শিক্ষা-দীক্ষা উদার মত ও আদর্শ সব বিসর্জন দিয়ে নিষ্ঠুর হয়ে ওঠে। মানুষের স্নেহ বা প্রেম স্বর্গীয় আদৌ নয়, নিতান্তই মাটির জিনিস, স্বার্থে পঙ্কিল পশুধর্ম।

তবু কিন্তু এত হীনতার মাঝেও উদার মানুষও আছে। মা দেশোদ্ধারী সন্তানকে হাসিমুখে মৃত্যুর মুখে তুলে দিয়েছে এ চিত্র আজকের বাঙলা দেশে বিরল নয়। তাই বলি নিঃস্বার্থ সংস্কার মুক্ত মানুষও সংসারে আছে, তারাই নির্লিপ্ত, তারাই যোগী, ভাল মন্দ 'সু' ও 'কু'র সামাজিক মনগড়া মূল্য তাদের সমতা ও ঔদার্য্য নষ্ট করতে পারে না। নিজের ক্ষুদ্র দেহ-



সতীশচন্দ্র সেনগুপ্ত

মনকে কেন্দ্র করেই জীবনে তারা বেঁচে নেই, একটা বড় আদর্শে প্রাণগত দেহগত স্বার্থকে ছাড়িয়ে উঠতে আসলে তারাই পেরেছে।

যখন আমার শৈশবের সঙ্গিনীটি আমাকে নিয়ে এত দুঃখ পেল তখন আমি আর একজনকে সদ্য হারাবার ব্যথায় মুহ্যমান, মন প্রাণ দেহ আমার সে ব্যথায় মূক ও আড়ষ্ট হয়ে আছে। উপর্য্যুপরি দুটো আঘাত এসে এক হপ্তার মধ্যেই দু'টি ভালবাসার বস্তুকে আমার জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে গেল। আমার বাল্য সঙ্গিনীর জীবনে তখন নতুন মানুষ তার পূজা উপচার নিয়ে মুগ্ধ অনুরাগে সবে ঢুকছে। এই অবস্থায় একটা সকাল বেলার তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে দু'জনে পেলুম নিষ্ঠুর আঘাত। আমার বোধ হয় কতকগুলো আড়ষ্ট কৃত্রিম মন গড়া ব্যবধান সৃষ্টি করে সেই কাঁটার বেড়ায় ঘা খেয়ে খেয়ে আমরা যতখানি ক্ষতবিক্ষত হই তার সবটুকু মানুষের কল্যাণের জন্যে অপরিহার্য্য নয়। মা বাপের কুল বড়, মান বড়, অর্থলিপ্সা বড়, মতামতের জিদ বড়, না কন্যার হৃদয়ের পরিপূর্ণ আনন্দ বড়? বাধা না পেলে যে প্রেম হয়তো সহজে ফেটে যেতে পারে বা অমূল্য চরিতার্থতা পেয়ে সারা জীবন স্থায়ী হতে পারে, আঘাত ও নির্য্যাতনে তা ফাটতেও পায় না, ফুটতেও পায় না, কাঁটা হয়ে শুধু রক্তপাত ঘটায় আর দেহ প্রাণের স্নায়ুকে আঘাতে আঘাতে ছিঁড়তে থাকে। কত যে হিষ্টিরিয়া, অপমৃত্যু, ব্যাধি, উন্মাদ রোগ ও স্নায়বিক পক্ষাঘাত তরুণদের জীবনে আসে জেদী মা

বাপের এই জল্লাদ বৃত্তির পথ বেয়ে তা'র হিসাব নিলে অবাক হতে হয়। ধর্ম্ম ও পরমার্থ জীবনে কিন্তু দেখেছি প্রকৃত জ্ঞানী গুরু শিষ্যের কোন ক্ষুধাকেই এ ভাবে চাপে না, ভোগের দ্বারা ক্ষয় করিয়ে মুক্ত করে নেয়। এইখানে নৈতিক গুরু আর ঈশ্বর সাক্ষাৎকারী গুরুতে আকাশ পাতাল তফাৎ। আদর্শ সমাজও তার নিয়মগুলি বাঁধে বেশ সহজ করে, নমনীয় করে flexible করে, কারণ মানুষের মন প্রাণ ও দেহের সুখ এবং স্বাস্থ্যই তো সমাজের লক্ষ্য।

এর পর আমি কলকেতা ছেড়ে চলে গেলুম, তার প্রথম কারণ এই আকস্মিক উদিত ঝড় ঝঞ্ঝা। তার দ্বিতীয় কারণ মেজদা'র প্রতিশ্রুতিভঙ্গ। তিনি আমাকে টাকা দেবার আশা দিয়ে দেশে পাঠালেন, কিন্তু পরে জানালেন তিনি টাকা দিতে অসমর্থ, কারণ তাঁর ছেলেপুলে হচ্ছে, তাদের শিক্ষা দীক্ষার ব্যয় আছে, ভাবী কন্যাগুলির বিবাহাদির উপায় করতে হবে। আমি কলকেতা ত্যাগ করে আমার শৈশবের লীলাভূমি দেওঘরে এই তীব্র নিরাশা ও ব্যথার স্মৃতি ভুলতে গেলুম। বাল্য ও কৈশোরের কত না সুখস্মৃতির স্বর্গ দেওঘর আমায় কোল পেতে নিল এবং তার অবাধ মাঠ, নীল পাহাড়, ঢেউখেলানো উঁচু নীচু পথের মায়াস্পর্শে সে ব্যথা জুড়িয়ে দিতে লাগল।

পনর

দেওঘরে রইলুম আঘাতে আঘাতে মূক অবশ ক্লান্ত মন প্রাণ নিয়ে। জীবনে যেন আর আঁট নেই, কোন লক্ষ্য নেই, একটা নির্দ্দিষ্ট গতি নেই। কার জন্তে কিসের জন্তে বেঁচে থাকা—জীবনের হাট জমানো, সুখসাধের ঘর বাঁধা? কোন একটা বড় আদর্শ বা লক্ষ্য তখনও জীবনকে আচ্ছন্ন ও আপাদ মস্তক দীপ্ত উজ্জ্বল করে জাগে নি। আদর্শ তখন যাও বা ছিল তা হচ্ছে স্বপ্ন—নিছক মানস তেমনি অলীক ও অস্পষ্ট, কাজে ফলাবার সুস্পষ্ট পথ নয়। সে সব স্বপ্নই গুঞ্জন করে একটি লাবণ্যমাখা মধুমাখা মানুষকে ঘিরে, আমার সাধ আশা তার নীড় রচনা করে আর একজনের চোখের নিবিড়তায়, আমার লক্ষ্যের সে অস্পষ্ট, মিলিয়ে-যাওয়া পথরেখা উধাও হয় কার যেন রক্ত পদপল্লবটি ছুঁয়ে তারই কুঞ্জ দুয়ার অভিমুখে। একজন

সঙ্গিনী হয়ে পাশে না বসলে জীবন-বীণা আমার বাজে না, রাঙা পা দুখানির সোণার কাঠি আমার বুকে সে না দিলে বুকের দীঘি ভরে পদ্ম ও কুমুদ ফোটে না। এ আমার কি হ'লো ? আর এক জনকে না নিয়ে কি ছাই আমার চলার উপায় নেই ? তাই যদি হ'লো তবে যাকে চাই তাকে পাই নে কেন ? একি বিড়ম্বনা !

দাদাদের টাকা আর নেব না, লেখাপড়া যখন ছেড়েছি তখন নিজের উপার্জ্জন নিজে করবো এই গোঁ ধরে আমি দেওঘরেই তিনটে প্রাইভেট টিউশনী নিলুম। মেজদা প্রতিশ্রুতি দিয়ে কথা রাখলেন না, এই অভিমানে আমার এলো স্বাবলম্বী হবার একরোখা গোঁ,—প্রাইভেট টিউশনী করে টাকা জমিয়ে নিজের খরচে আমার দিবাস্বপ্নের কৃষি-কুটীরটি গড়বো একদিন, এই হলো আমার জেদ। সকাল সন্ধ্যা তিন জায়গায় ছেলে পড়িয়ে আমি পেতুম মাত্র ২৮৲ টাকা; খাই খরচের জন্যে দিদিমার হাতে দেবার কথা হ'লো পনর, বাকি টাকা জমা হবে ডাকঘরের সেভিংস্ ব্যাঙ্কে। বোধ হয় একমাস এই মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রোজগার চলেছিল। তখনও দিদিমাকে এক পয়সাও দিই নি, সব টাকাটাই ডাক ঘরের পাশ বইএ জমার অঙ্ক মোটা করে শোভা পাচ্ছে। আর আমার আশার পূর্ব্বাচল আলোয় আলোয় রঙীন করে তুলছে। এমন সময় আবার জীবনে আঁধি নিয়ে বিদ্যুৎ হেনে বাজ ডেকে ঝড় উঠলো।

তার কিছু আগে আমার ভালবাসার সেই মেয়েটি আত্মীয়-

স্বজনের সঙ্গে দেওঘরে এসেছে। দেখা আমাদের বড় একটা হ'তো না, কারণ তার মায়ের সতর্ক দৃষ্টি এড়িয়ে দু'জনে একান্ত হবার কোন উপায়ই আর ছিল না সেই কলকেতার ছাদের ঘটনার পর। তাই রোজ আমি লুকিয়ে একটা করে চিঠি দিতুম আর একটা করে তার মধুমাখা উত্তর পেতুম। সে লিখতো নিতান্তই সাদাসিধে চিঠি, তার গদ্যময় মোটা মনের সহজ ভাষায় একটু আদর সোহাগের চিনি মাখিয়ে চলনসই মিঠে করে লেখা দশ বারটি লাইন। তারই প্রতি ছত্রে প্রতি বর্ণে আমার চোখে কি মধুই যে ঝরতো, বার বার তাই পড়ে চোখের জল রাখতে পারতুম না। এই সময় আমরা প্রতিশ্রুতি-বদ্ধ হয়েছিলুম দু'জনে পরস্পরের জন্যে আজীবন চিরকৌমার্য্য নিয়ে আশা পথ চেয়ে থাকবো, একটি সুদূর ভবিষ্যৎ মিলনের সুদিনের প্রতীক্ষায়। এই চিঠির একখানি একদিন দৈবাৎ ধরা পড়ে গেল।

কাপড় ছাড়তে গিয়ে স্নানের ঘরে সে বুঝি ফেলে এসেছিল আঁচলের খুঁটে বাঁধা চিঠি। মুখ অন্ধকার করে তার বাপ এসে আমায় যৎপরোনাস্তি তিরস্কার করলেন, তার চিঠিগুলি ফিরে চাইলেন। আমি তখনই পোষ্ট অফিস থেকে টাকা ক'টি তুলে নিয়ে আমার ঘর-ছাড়া নিরুদ্দেশ যাত্রার পথে পা বাড়ালুম। যাবার সময় বড় মামাকে লিখে গেলুম—আমায় যেন খোঁজা না হয়, কারণ আমি ইহা জীবনে আর ঘরে ফিরবো না। আসরফিয়াকে নিয়ে জসিডি ষ্টেশনে গিয়ে প্রথমে আপ ট্রেণে

শিমুলতলায় নামলুম, যাতে কেউ খুঁজতে এলে আমাকে না পায়। তার পর আবার ডাউন ট্রেণে করে যাত্রা করলুম বর্দ্ধমানের পথে। যদি কেউ খোঁজে কলকেতার পথেই খোঁজ করবে, এই ছিল আমার ধারণা, অথচ আমার মত বাঁধন ছেঁড়াকে খুঁজবে যে না কেউ তা' ঠিক ভেবে উঠতে পারি নি।

রাঙা মা আমার তখন বর্দ্ধমানে একটি বাড়ী ভাড়া করে আছেন। সঙ্গে আছে বন্ধু সুরেন। মা তো আমাকে পেয়ে আকাশের চাঁদ হাতে পেলেন, তখনই প্রতিশ্রুতি দিলেন তাঁর দপ্তরি পাড়ার বাড়ী বেচে আমায় কৃষির জন্যে টাকা দেবেন। এই বর্দ্ধমানে একমাস থাকার পর কলকেতায় মেসে এসে উঠলুম যোগাড় যন্ত্র করে মায়ের বাড়ীখানি বিক্রমপুরে দেবার উদ্দেশ্যে। এই দুঃসাধ্য সাধন করে তুলতে সুরেনের ও আমার কয়েক মাস লেগেছিল। সুরেন থাকতো কলেজ ষ্ট্রীট Y. M. C. Aতে আর আমি থাকতুম ওরই কাছে কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীটের এক মেসে। হাতে টাকা নেই, উপার্জ্জন নেই, সহায় সম্বল কিছু নেই এই নির্ব্বান্ধব কলকেতার জনারণ্যে। নীচে য়্যাণ্ড্রু ইউল কোম্পানি সেই প্রথম এক পয়সা কাপের চায়ের দোকান খুলেছে আর তার পাশেই ব্রজেন দত্তের ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরী।

ছেলে বেলা থেকে ধুঁইয়ে ধুঁইয়ে "মিনার" নাম দিয়ে একটা উপন্যাস লিখেছিলুম, ষ্টুডেন্টস্ লাইব্রেরীর এই ব্রজেন বাবু সেখানা ছাপাবার ভার নিলেন। সে বই যখন বেরুল তখন আমি কোথায় তা এখন আর মনে নেই, সে ছেলেমানুষী

লেখা খেলো বই কখন কেউ দেখেছে বা বিক্রী হয়েছে বলে মনে হয় না। এই সময়টা কলকেতায় আমার বড় দুঃস্থ অবস্থায় কাটে। অর্থোপার্জ্জনের কোন উপায় নেই, সংস্থান নেই, সে রকম কোন শিক্ষা দীক্ষাও নেই; খবরের কাগজে wanted column এ চাকরী খালি দেখে দরখাস্ত করছি আর মেসের ভাত খাচ্ছি। দু তিন মাসের টাকা মেসে দেনা জমে গেল, ম্যানেজার মুখ অন্ধকার করে তাগাদা জানাতে লাগলেন। কোন উপায় না দেখে আমি গেলুম উডল্যাণ্ড্‌সে কুচবিহারে রাজবাড়ীতে বড়দা'র কাছে। বড়দা আমার দুঃস্থ অবস্থার কথা শুনে বললেন, "আচ্ছা, অমুক দিন আসিস্, যা' পারি দেব।" সেই ক'দিন ম্যানেজারের সামনে না পড়ে দিন কাটানো ভার হয়ে উঠলো, নীচে চায়ের দোকানে চা খাওয়া আর রাস্তায় রাস্তায় ঘোরা ছাড়া উপায়ান্তর রইল না। নির্দ্দিষ্ট দিনে ভোর আটটায় গিয়ে দেখি দাদা ঘুমচ্ছেন, আমাকে দেখে বালিসের তলায় হাত দিয়ে ত্রিশ না চল্লিশ টাকার নোট বার করে দিলেন, বললেন, "এখন এই নে, তারপরে আবার দেব।" আমায় রাজ-পরিবারের টেবিলে খেতে বললেন, লাজুক আমি তাঁর ঘরে বসেই একটা অমলেট আর রুটি মাখন খেয়ে নিলুম। এই সময় মনে আছে আলিপুরের ব্রীজের কাছ থেকে একটা জমকালো ফিটন গাড়ী ভাড়া করে তাই হাঁকিয়ে ষ্টাইলের উপর গিয়ে দাঁড়াতুম রাজপ্রাসাদের গাড়ী বারাণ্ডায়, তাই দেখে চাপরাস বাঁধা দরোয়ান ও বয়রা ছুটে আসতো এবং খুব খাতির

করে আমাকে বসিয়ে দাদাকে খবর দিত। অথচ সমস্ত পথটাই গেছি হেঁটে বা ট্রামে হটর হটর করে, ফিটনের ভাড়া দিয়েছি চার আনা। তারপরে হেঁটে গিয়ে দেখেছি দাদার নিজের চাকর ছাড়া আর কেউ ছুটেও আসে না, খাতিরও করে না। বড় লোকের বাড়ীর এই কায়দায় ওরা কখন কখন খুবই বেকায়দায় পড়তে পারে কারণ রোণাল্ডশের মত লাট সাহেবও তো একদিন পদব্রজে এসে দেখা দিতে পারেন। মহাত্মাজী এলে বোধ হয় হাজার-করা নয়শ নিরানব্বইটা বড়লোকের বাড়ীতে গলাধাক্কা খান যদি সঙ্গে হোমরা চোমরা লেজুড়গুলি না চলে। তবে সৌভাগ্য ক্রমে মহাত্মাজীর মুখটা সবারই চেনা, এই যা রক্ষে।

আমাদের দেশের সভ্যতায় এ কৃত্রিম বড়মানুষীর জিনিসটা কিছু এমন কদর্য্য ভাবে ছিল না, কারণ এদেশে চির দিনই রাজরাজড়ার ঘরে পূজা পেয়ে এসেছে সাধু, ন্যাংটা ফকির ও সাদাসিধে পণ্ডিত, কবি ও চিত্রকর। পূর্ব্ব যুগে অষ্ট অলঙ্কারে ছত্র চামরে সেজে দরবারে বসার সময় পর্য্যন্ত রাজাও থাকতেন প্রায় ঐ মহাত্মাজীরই মত বেশে। অন্ততঃ অজন্তা ইলোরার পাথরে কাটা মূর্ত্তিগুলিতে ঐ রকমই স্নিগ্ধ শুচি একটি নিরাভরণ সৌম্য বেশের পারিপাট্যই দেখতে পাই। কৃত্রিম বিলাস আরম্ভ হ'লো মোগলাই আমল থেকে, তবু তারও মধ্যে ছিল একটা চারু শিল্পের ললিতস্পর্শ ও মানুষের গরিমার ছবি। প্রফুল্লের রাণী গিরির ঠাটের মত তা'তে মন প্রাণ হৃদয় শক্তির

মহিমায় ও লাবণ্যে মুগ্ধ করে দিত, মানুষের অন্তরেরই বিভূতি ও ঐশ্বর্য্যের হচ্ছে ও-গুলি যেন খুব সহজ সুন্দর বহিঃ প্রকাশ। অহঙ্কার বা বৃথা ধন গর্ব্বের আড়ষ্ট ও কুৎসিৎ ভঙ্গী তাতে ছিল না বললেই হয়। নিছক মুদ্রা রাক্ষসের আসুরিক পূজারী তখনও মানুষ পূরো মাত্রায় হয় নি। এটা একেবারে আধুনিক ইঙ্গবঙ্গ ধারা।

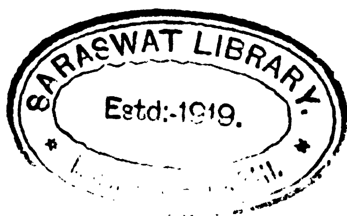
দাদার কাছে টাকাটা পেয়ে আমি মেসের পাওনা চুকিয়ে তবে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলুম, এত দিন পর ম্যানেজারের সামনেই আবার বুক ফুলিয়ে সহজ মানুষের অসঙ্কোচ ভাবে আসা যাওয়া করা সম্ভব হয়ে উঠলো। কিন্তু মেসের ঋণ পরিশোধ করে যৎসামান্য টাকাই হাতে রইল, তা' দিয়ে টেনে-টুনে আর এক মাস চালানো যেতে পারে। তার পর? তার পর যে কি হবে তা' দেখে চলা আমার জীবনে আজ অবধি তো হ'লো না, সংসারীর হিসেব করে চলা বুঝি বিধাতা পুরুষ কুষ্টিতে লেখেনই নি। এক একবার একটা না একটা ঘটনার ধারা বছর কয়েক ধরে জীবন নটমঞ্চ জুড়ে চলেছে, তারপর যখন পালা সাঙ্গ হয়ে এসেছে তখন হঠাৎ পূর্ণচ্ছেদ টেনে দিয়ে কালো যবনিকা নেমে এসেছে। তারপর আবার হাট জমিয়ে দর্শকের মন প্রাণ হরে নিয়ে যে কি খেলা আরম্ভ হবে—কোন্ নতুন পালার মহলা চলবে তা' আমি আগে থেকে কখন বুঝতে পারি নি।

ভেবেছিলুম করবো কৃষি কিন্তু হয়ে পড়লুম দোকানদার

সেই ইতিহাস এবার বলতে বসছি। মায়ের বাড়ীখানি তিন হাজার আড়াই হাজারে বিক্রি না করেও আর উপায়ান্তর ছিল না; কারণ, মা ঋণ করে একতলা বাড়ীকে দোতলা করেছিলেন, সেই ঋণ এতদিন ধরে গোকুলে কেষ্ট ঠাকুরটির মত চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ছিল। এমন ঋণ আছে যার আসল তবু হয়তো না খেয়ে দেয়ে কখনও বা পরিশোধ করা যেত যদি সুদেরও পার পাওয়া যেত; সুদের সুদ, তার সুদ এবং সবগুলি অচিরাৎ আসলে পরিণত হয়ে আবার তার সুদ, এবম্প্রকার ছারপোকার বংশকেই মেরে উচ্ছন্ন করতে গৃহস্থ নাকের জলে চোখের জলে এক হয়, কাজেই তার পক্ষে আসলের কাছেও ঘেঁষা দায় হয়ে উঠে। দেশ যদি কখন স্বাধীন হয় তা' হলে কাবুলী বেণে ও মহাজনরূপ রক্তশোষক জানোয়ারগুলি যাতে সুন্দরবনের নরখাদক বাঘের মত ক্রমে নির্ব্বংশ হয়ে আসে সে চেষ্টা বিধিমতে করতে হবে। ভ্যাম্পায়ারের মত মানুষকে দরিদ্র ও বিপন্ন দেখলেই সে মানুষের করবে রক্ত শোষণ—তার দৈন্যকে করবে নিজের অর্থ-লালসার ব্যবসার পুঁজি, এর চেয়ে ঘৃণ্য ও নিষ্ঠুর ব্যাপার আর কি আছে? বাঘের মত ধরে নখে ছিঁড়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যে উদরসাৎ করা এর চেয়ে ঢের কম নির্ম্মম। য়ুরোপে Inquisition এর যুগে যত রকম যন্ত্রণা দেবার যন্ত্র ও উপায় ছিল তার মধ্যে ছিল একটা পাথরের ঘর। অপরাধীকে তার মধ্যে পুরে রাখলেই তারই চোখের ওপর শনৈঃ শনৈঃ সেই দুয়ার জানলা হীন ঘরের চারটি নিরেট দেয়াল সরে সরে ছোট

হয়ে আসতো, তারপর সেই ক্রম অপরিসর জায়গায় আটকা পড়ে একটুখানি বাতাসের অভাবে খাবি খেতে খেতে সে বেচারী কি ভাবে চেপ্টে পিষে যেত সেই নিষ্ঠুর দেয়ালের চাপে তার ভয়াবহত্ব কল্পনায় সামান্য মাত্র অনুভব করা যায়। কুসীদ-জীবী মহাজন বা সুদখোর কাবুলীর চক্রবৃদ্ধি হারে বাড়ন্ত ঋণের চাপে পড়ে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে মানুষের ঠিক তেমনি অবস্থাই হয়। তার মনের শান্তি যায়, চোখের নিদ্রা যায়, ক্ষুধা তৃষ্ণা যায়, মান সম্ভ্রম যায়, বাস্তভিটা যায়, শেষে ছেলেপুলের হাত ধরে দেশান্তরী হতে হয় যদি তার আগে শ্রীঘর না অদৃষ্টে জোটে। মানুষের ধারণা বিধাতার জীবজগতে সে-ই সকলের শ্রেষ্ঠ উন্নত সৃষ্টি, কিন্তু একথাও ঠিক যে ক্রূরতায় বুদ্ধিজীবী সে পশুকেও পরাস্ত করেছে। মানুষ হয়তো সত্য সত্যই শ্রেষ্ঠ, খুব উঁচু শিখরের গায়েই পাতালপুরীর মত নীচু খাত ও গহ্বর থাকে।


SARASWAT LIBRARY
Estd:-1919.
MAKARDAH-HOWRAH.



ষোল

মায়ের বাড়ী বিক্রীর টাকা ঋণ পরিশোধের পর গিয়ে দাঁড়াল মাত্র নয়শ' টাকায়। এত অল্প টাকায় কৃষিক্ষেত্র করা যায় না, জমি কেনবার টাকা চাই, চাষ আবাদের খরচ চাই; জলের ব্যবস্থা, কুটীর রচনা, গোধন সংগ্রহ—এর কোন্‌টা মূলধন বিনা হয়? তারপর অন্ততঃ পুরো একটি বছরের খরচ হাতে রেখে চাষ-বাসের কাজে নামা দরকার। দেওঘরে জগদীশ-পুরের কাছে যে জমি পাওয়া যাচ্ছিল তার জন্যে অন্ততঃ দু'হাজার থেকে আড়াই হাজার টাকা দরকার অথচ আমার হাতে এল মাত্র নয়শ' টাকা। দেওঘর থেকে ৬।৭ মাইল দূরে জগদীশপুর—দুইটি ঢালু পাহাড়ের মাঝে লাল মাটির মেলা, সেইখানে কৃষির স্বপ্ন রচনা ফুরিয়ে গেল টাকার অভাবে। কলকেতায় যে মেসে আমি থাকতুম সেইখানে একটি ছেলে থাকতো। কলেজ ষ্ট্রীট ও হ্যারিসন রোডের ঠিক মোড়ে উত্তর

দক্ষিণ কোণে তার ছোট্ট মনোহারীর দোকানটি ছিল, তার দোকানে গিয়ে আমি প্রায়ই গল্পগাছা করতুম। ও মেসে সেই ছিল আমার একমাত্র বন্ধু। তার পরামর্শ আমি জিজ্ঞেস করলুম, কি করা যায়, টাকাতো মাত্র নয়টি শ, এ দিয়ে কৃষি হয় না অথচ একটা কিছু তো করতেই হবে, কারণ পেটের দায় বড় দায়। তার নাম বোধ হয় ছিল সুধীর বা অমনি একটা কি, দোহারা ছিপছিপে কর্মঠ মানুষটি, অবিবাহিত, একেবারে স্বাবলম্বী, হাসি তার মুখে লেগেই থাকতো। আমার জীবন নাটমঞ্চের একদিক দিয়ে ঢুকে সে আর একদিক দিয়ে বেরিয়ে কোথায় যে হারিয়ে গেছে তা আজ আর বলতে পারিনে। সে আমাকে প্ররোচনা দিতে লাগল, "বারীনদা, তুমি দোকান কর।"

আমি। কোথায় ?

সু। পাটনায় তো পড়েছ, সেইখানে করগে ; কলকেতায় অত অল্প টাকায় ব্যবসা খাড়া করতে পারবে না।

তাই ঠিক হলো, মা যাবেন সঙ্গে, কিন্তু আগে আমি গিয়ে দোকান সাজিয়ে বসবো। সুধীর উঠে পড়ে লেগে মুরগীহাটা ও রাধাবাজার ঘুরে সস্তায় পাইকারী দরে আমার মাল কিনে প্যাক করিয়ে দিল,—সাবান, চিরুণী, কাগজ-পেন্সিল, সেণ্ট-পাউডার, বল, মারবেল, রঙীন সূতো, পুঁতির মালা,—মানুষের মন ভোলাবার কত রকম সরঞ্জামই না আমার সঙ্গে চললো। বাঙলার নীল আকাশ ও শ্যাম ধরণী ছেড়ে একার দেশে ধূলোয়

জগতে—লাল মাটির রাজ্যে। পাটনা কলেজের গেটের সামনে বাঁ দিকে রাতারাতি সাইনবোর্ড উঠলো—"B. Ghose's Stall," দু'টি পাশাপাশি ঘর, একটি ছোট আর একটি লম্বায় বড়। বড় ঘরটিতে খান দুই আলমারীতে মাল সাজিয়ে একখানা তক্তপোষ ফেলে ছোট্ট টেবিল চেয়ার নিয়ে আমি চশমা চোখে বাবরী চুল মাথায় বসে গেলুম মনোহারী দোকান সাজিয়ে। মনোহারী দোকানের রকমারী রঙীন মালের চেয়ে দোকানীই বোধ হয় বেশী মনোহারী হয়ে উঠলো, কারণ আলাদীনের প্রদীপের রাতারাতি সৃষ্ট এই ক্ষুদে দোকানীকে দেখে স্কুল-কলেজের ছাত্রদের সেখানে লেগে গেল ভিড়। তারা আর কিছুতেই এই অকস্মাৎ নতুন দোকানীর টান ছাড়িয়ে চলে যেতে পারে না, লাজ লজ্জা কুল মান খুইয়ে সাবান পেন্সিলের দর যাচাবার অছিলায় পথ চলতে ঢুকে পড়ে আর ছুতায় নাতায় এই অভিনব অদ্ভুত কবি-কবি দোকানীকে বেশ এক চোখ দেখে নেয়।

ভিড় দেখে আমার মাথায় খেললো চায়ের দোকান দেবার মতলব। কলকেতায় মেসের নীচে য্যাণ্ডু ইউলের চায়ের দোকান দেখে অবধি ঐ পোকাটি আমার মাথায় ছিল, খদ্দের জমাবার এ মন্দ ফিকির নয়, তার ওপর একটা নতুন কিছুও বটে। ভদ্র-লোকের ছেলের চায়ের দোকান দেওয়া সেই-ই প্রথম। আজ যে চায়ের দোকান নানা দেশী বিদেশী চটকদার কাফে, ক্যাবিন, রেস্তোরাঁ, গ্রিল আদি নামে রাস্তার মোড়ে মোড়ে গজাচ্ছে আর মরছে তখনকার দিনে সে দিকে কারু মাথা তখনও

খেয়ে নি। বোম্বাইয়ে পার্সীদের 'টি ষ্টল' ছাড়া আর কোথাও কারু এ জাতীয় জিনিস আমার চোখে পড়ে নি।

B. Ghose's

Tea Stall

Half anna cup, rich in cream

এই সাইনবোর্ড মারা ছোট্ট ঘরটিতে অয়েল ক্লথ পাতা টেবিলে বিস্কুট, টোষ্ট, ডিম ও গরম গরম এক কাপ চা খাবার ভিড় সে এক্. দেখবার জিনিস। প্রধান খরিদ্দার দাঁড়াল একজন মোটা কসমের নিউজপেপার রিপোটার; প্রতিদিন সকাল বিকেল চার পাঁচটা করে হাফ বয়েল্ড ডিম ও টোষ্টের চাটের সাহায্যে কাপের উপর কাপ কলির দিন পঁচিশ উড়িয়ে ভদ্রলোক একদিন হঠাৎ একেবারে উধাও। হপ্তা দুই পর বিলক্ষণ রোগা জীর্ণ শীর্ণ হয়ে ভদ্র-সন্তান এসে হাজির, চিঁ চিঁ কণ্ঠে বললেন, "বারীনদা, দিন এক কাপ চা—যা থাকে অদেষ্টে"

আ। একি! আপনার হয়েছিল কি? অতবড় নাদুস নুদুস ভুঁড়িদার শরীরখানি শেষটা এই হয়ে গেছে!

এতখানি দরদ পেয়ে ভদ্রলোক এক মিনিটে গলে আমার পরম আত্মীয়ে পরিণত হয়ে গেলেন, সখেদে বললেন "আর মশাই, বলবেন না, বলবেন না দুঃখের কথা। রোজ রোজ অতগুলো করে ডিম খেয়ে ফোড়া হয়ে যাই আর কি, গোটা

চল্লিশেক হয়েছে আর ফেটেছে, এখনও দেখুন এইখানে একটা মুখ নিয়ে উঠছে, আর এই পাছার ফুটো এখনও সারেনি।

মনমরা ভদ্রলোক আজ আর ডিম খেলেন না, এক কাপ চা আর গোটা দুই টোষ্ট হাতে নিয়ে সনিশ্বাসে করুণ নেত্রে ডিম্ব-ভোজী সহ-পায়ীদের দিকে চেয়ে রইলেন। আর একজন লম্বা কসমের দোহারা কালো ছেলে আসতো, সে কলেজে পড়ে, ধনীর দুলাল, একটু আদর্শের ভাবুক। আমার চোখা চোখা বুলির মোহে নলেন গুড়ে মাছির মত তার ডানা ও পা জড়িয়ে গেল, সে হলো আমার দোকানের সবচেয়ে মঙ্গলাকাঙ্খী বন্ধু। এত দিন পরে এখন আর তার নাম বা মুখাকৃতি মনে নেই, তবে তার উদার বন্ধুবৎসল প্রাণের স্পর্শটুকু ভোলবার নয়; যদি আজও সে বেঁচে থাকে তা' হলে এই আত্মকাহিনী পড়ে হয়তো সাড়া দেবে। নয়তো টাকার বা মান-যশের গভীর ফেরে এমন অসাড় সে হয়ে গেছে যে, যৌবনের সে দিনগুলির মূল্য আর তার কাছে অতখানি নেই, একদিনের মুগ্ধ চোখের মণি মুক্তা আজ ছেলে খেলার ঝিনুকে ও ঝাঁঝরে পরিণত হয়েছে। তা' যদি হয়েই থাকে তো তাকে দোষ দিতে পারা যায় না, কারণ—এই তো আমাদের জীবনে অহরহই হচ্ছে, আজ যারা পালা সাঙ্গ করে আসর ছেড়ে যাচ্ছে কাল তাদের সে ত্যক্ত ভাঙ্গা আসর আর এক সুরে অভিনয়ে আর এক দলের কথকতায় জমে উঠছে, দেব-লোকের অতিথিরা নাগলোকের মানুষের সঙ্গে মিশ খায় না

বলেই একদল বেরিয়ে গেলে পরে আর একদলের আলো গানের সমারোহ হচ্ছে।

একদিন দুপুর বেলা দোকানে বসে আছি তীর্থের কাকের মত খরিদ্দারের আশায়, এমন সময় আমার লুব্ধ চোখ মুগ্ধ করে উদয় হলেন ঘোড়ার গাড়িতে এক হিন্দুস্থানী সাহেব। তাঁর সাহেবী পোষাক, চাঁচা ছোলা কেতাদুরস্ত ভাবে কামানো মুখ, হাতে রিষ্টওয়াচ, মুখে বিশুদ্ধ উচ্চারণের ইংরাজি বুলি। সাহেব এলেন, এটা ওটা দেখে কিনলেন অনেক কিছু জিনিস, যাবার সময় ঠিকানা দিয়ে বলে গেলেন টাকা নিয়ে আসতে! আমি তো কৃতকৃতার্থ, আনন্দে আত্মহারা, এত বড় দরাজ হাতের সৌখীন খদ্দের এ দগ্ধ অদৃষ্টে টিঁকলে হয়। তার পর সাহেব প্রায়ই আসতেন, জিনিসও নিতেন বিস্তর এবং ঐ পর্য্যন্ত। রূপচাঁদ ওরফে টাকা বস্তুটি তাঁর ছিল না। এমন বিশুদ্ধ idiomatic ও সাহেবী ইংরাজি কিন্তু লিখতে ও বলতে আমি ছাতুর দেশে কম শুনেছি।

যে দিন প্রথম টাকা আনতে গেলুম, দেখলুম সাহেব একটা তোয়ালে পরে খালি গায়ে আছেন, আমাকে সমাদর করে বসালেন। টাকা দিলেন দশটি এবং সুদূর ভবিষ্যতের দিকে আশার সঙ্কেতে প্রতীক্ষা করতে বললেন বাকি ৩০।৪০ টাকার জন্যে। টাকা মারা যাবে না তবে কিনা ইয়ে—ইত্যাদি। আমি তখনও আশার লোভে আপ্যায়নে গদগদ, তখনও ঠিক ধরতে পারি নি কি কুক্ষণে কত বড় শনি সেদিন দুপুরবেলা আমার

দোকানে উদয় হয়েছিল। পরে জানলুম ধীরে ধীরে সাহেব আকণ্ঠ নিমজ্জিত, আর কোথায়ও ধারে জিনিস পাবার উপায় না থাকায় হঠাৎ নতুন দোকান দেখে সাহেব বিশেষ ভাবে আমাকেই কৃপা করতে এসেছিলেন। তাঁর পেশা লোকের দরখাস্ত, আপিল ইত্যাদি লেখা এবং আয়ের অধিক মদে দিবারাত্র চূর হয়ে থাকা। আমার দোকান ডুবলো যে কয়টি কারণে এই ধারবাজ সাহেবটি তার অন্যতম।

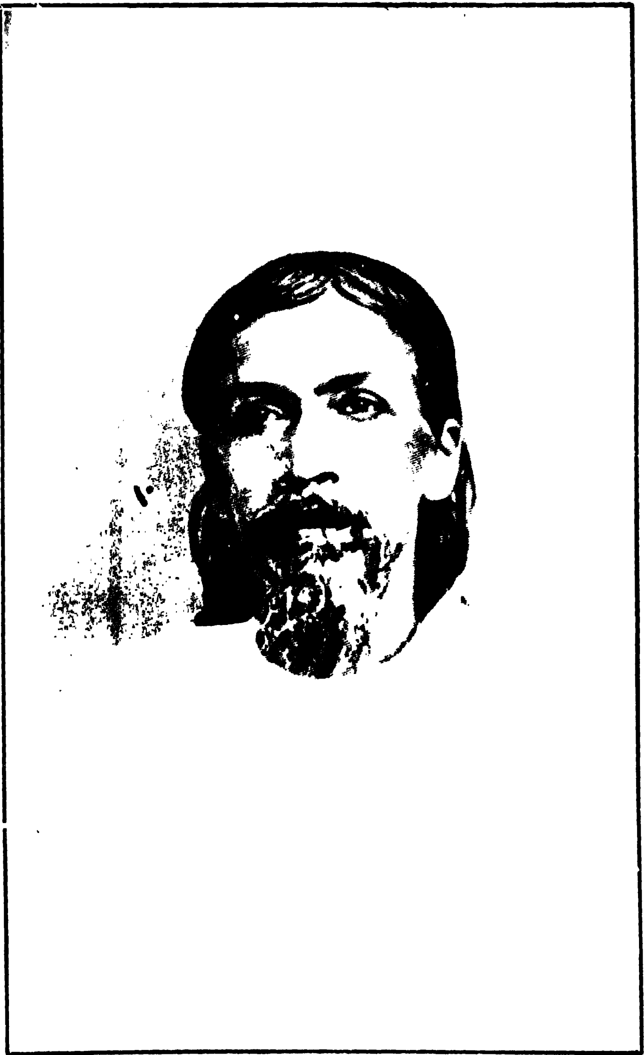
বাঁকিপুরে বাঙালীর আরও বড় বড় মনোহারী দোকান ছিল, কারু মূলধন দশ হাজার, কারু বা পনর বিশ হাজার; তার মাঝে ছয় সাত শ' টাকার ঐ এতটুকু দোকান কিছুদিন যে আসর জমকে ছিল এই-ই আশ্চর্য্য। ইতিমধ্যে আমি সেই দু'খানি ঘরের ভিতর দিককার বাড়ীখানাও নিয়েছি, রাঙা মাকেও কাছে এনেছি, একটা চাকর রেখেছি, আর চায়ের দোকান ফুলে ফেঁপে চপ্ কাটলেটের দোকানে পরিণত হয়েছে। ভিতর বাড়ীতে মা রাঁধতেন মাংসের কারি, চপ ও কাটলেট, আর আমি তা' চায়ের মজলিসে বেচতুম মাখন, রুটি ও ডিমের সঙ্গে সঙ্গে। চাকরটা বাসন ধুতো, ফাই ফরমাজ খাটতো আর চায়ের টেবিলে বয়ের কাজে যোগান দিতো। প্রদীপটি নিভবার আগে যেমন শেষ তেলটুকু নিঙড়ে চুষে নিয়ে দীপ্ত শিখায় চারদিক আলো করে ওঠে, বি ঘোষের টল্ তেমনি বাঁকিপুরের কলেজের সিং দরজা আলো করে জমকে উঠলো আশু ও অনিবার্য্য মৃত্যু মরবার আয়োজনে। চিরদিন আশার

আশায় রঙীন প্রাণ আমার তখনও স্বীকার করেনি যে ব্যবসাটি আমার অচিরেই শিঙে ফুঁকবে, কিন্তু সব ব্যবস্থা ও আয়োজন তার আমিই নিজের হাতে তখন করে এনেছি।

উঠতি ব্যবসা—যার মূলধন এক রকম নেই বললেই হয় তার ঘাড়ে একটি গোটা সংসার চাপানো তাকে বধ করবার ব্যবস্থা ছাড়া আর কি? একটা বড় বাড়ীর ভাড়া, চাকরের মাইনে, মায়ের ও আমার খরচ পত্র যোগাতে গিয়ে ছোট্ট মনোহারী দোকানের লাভের কড়ি তো নিত্য নিঃশেষ হতে লাগলই, মূলধনেও অল্প বিস্তর টান পড়তে লাগলো। চপ কাটলেট কারি কোপ্তার দোকান তখন আনকোরা নতুন, তার ওপর সেটা হচ্ছে ছাতুর দেশ, বাঙালী ছেলে অনেক থাকলেও সৌখীন ইয়ারবাজ কসমের ছেলে খুব বেশী যে ছিল তা' নয়। সুতরাং লাভ প্রয়োজনের অনুযায়ী তো হ'লই না উপরন্তু রিজার্ভ ফণ্ড তিন শ' টাকা হোটেল কর্ত্তেই গলে গেল। ক্রমশঃ আমার মত হিসাব জ্ঞানহীন আনাড়ির চোখেও অদূর ভবিষ্যৎটা অন্ততঃ আমার মনি ব্যাগের চোপসানো পেটটা দেখেই স্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে লাগল। পয়সার অভাবে কলকেতা থেকে মাল আর আনাতে পারা গেল না, পাটনার পাইকেরেরই শরণাপন্ন হতে হ'লো। তাতেও লাভের পরিমাণ এলো বিলক্ষণ কমে; ক্রমশঃ এমন হলো যে, জিনিস-পত্র ফুরোতে লাগলো এবং তা' পূরণ করতে না পারায় খরিদ্দারও ফিরতে লাগলো বিস্তর। এই ভাবে গালে হাত দিয়ে একমাস কাটাবার পর একদিন

আমার বন্ধুটিকে সব ব্যাপার খুলে বলায় সে নিজের পকেট খরচ থেকে জমিয়ে ৯০৲ টাকা আমায় দিল। তখন তার বাপ মা অভিভাবক রূপে বেঁচে বর্ত্তে আছেন, এর বেশী সে করে কোথা থেকে? এই নব্বই টাকায় আরও কিছুদিন ঠেক্‌নো দিয়ে ব্যবসার পড়ো পড়ো চালাখানা খাড়া রাখা গেল, তার পর the deluge—জল প্লাবন অর্থাৎ কিনা 'পপাত চ মমার চ'।

মায়ের সঙ্গে পরামর্শ করে আমি স্থির করলুম যে, বরোদায় সেজদা' শ্রীঅরবিন্দের কাছে গিয়ে কিছু মূলধনের চেষ্টা করবো। মা তাঁর চাকরটিকে নিয়ে আপাতত ভাঙ্গা সংসার আগলে থাকবেন—যতদিন না আমি ফিরে আসি, তারপর না হয় বাণিজ্যের বাসীন্দা লক্ষ্মী ঠাকরুণকে ছেড়ে আবার কৃষির সুখ-স্বপ্নে ডুব মারা যাবে। আমার দোকানের কাছেই একজন চাপ-দাড়ি ব্রাহ্মের প্রকাণ্ড মনোহারী দোকান ছিল, জিনিসের ফর্দ্দ করে সেই পাল মশাইকে রাতারাতি মাল পৌছে দিয়ে, আমি মায়ের সঙ্গে তাদের টাকা পাবার ব্যবস্থা করে দিলুম, স্থির হ'লো মাল বেচে হোক রেখে হোক তাঁরা মাকে প্রাপ্য টাকা দেবেন। পরের দিন ভোরের ট্রেণে আমিও বাঁকিপুর ত্যাগ করলুম আর বি ঘোষের ষ্টলের চটকদার সাইনবোর্ড খানি হঠাৎ গেল উবে। এ দোকান যে রাত পোহালেই শিঙে ফুঁকবে এ সংবাদ তখনও বাঁকিপুরে কেউই জানতো না—বাদ আমার সেই শ্যামবর্ণ দীর্ঘচ্ছন্দ শান্তমুখশ্রী বন্ধুটি। চায়ের



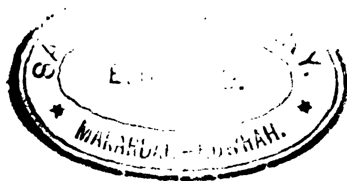
শ্রীঅরবিন্দ ঘোষ

চাতাল নেশাড়েরা সেদিন ভোরে ও সন্ধ্যায় দোকানের বন্ধ দরজায় প্রথমে বিস্ময়-বিমূঢ় ও পরে বিরস ম্লান মুখে ভিড় জমিয়ে ছিল নিশ্চয়ই। আমি তখন উড়ন্ত পাহাড় পর্ব্বত দু' পাশে ফেলে, নদী নালা বন কান্তারের মেলার মধ্যে দিয়ে হু হু করে চলেছি আমার জীবনের নতুন রঙ্গভূমির দিকে।

আমি যে মাণিকতলা বাগানের বোমাড়ে বারীন ঘোষ হতে চলেছি, সেই উদ্ভট বিপ্লবের প্রথম পুরোহিত হব বলেই যে আমার এত সাধের চায়ের দোকান আর মনোহারীর বিপণী দেখতে দেখতে আকাশ কুসুমের মত ফুটলো আর মিলিয়ে গেল তা' তখন আমিই বা জানব কেমন করে? আজকের বিফল প্রণয়ী যদি বুঝতো তার আজকের এই মর্ম্ম ছেঁড়া বিরহ কালকের নতুন রূপের ডালী ষোড়শীর আসার আয়োজনেই, তা' হ'লে তার এত সুখমাখা হা হুতাশ আর কলিজা নিঙড়ানো অশ্রুধারা ফুরিয়ে গিয়ে হয়তো গোঁফের কোণে চোরা হাসিই দেখা দিত। আমাদের সারা জীবনটা এত মিষ্টি, এতখানি কৌতূহলোদ্দীপক ও নিতুই নতুন এই জন্যেই যে, তার পাতাগুলো মোড়া আছে, একটির পর একটি অজানা পাতা উল্টে চলেছি আর গল্পের রসবস্তু গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে জমে চলেছে বলেই না পালার পর পালার সুখ দুঃখ হাসি অশ্রু বেদনা পুলক আমাদের চোখে এমন নর্ম্মান্তিক সত্য হয়ে উঠছে। একটি ময়লা ক্যান-ভাসের ব্যাগ হাতে নিয়ে ট্রেণে যখন চেপেছি তখন মনে জাগছে টাকা নিয়ে ফিরে আসার আকাশ কুসুম, ফাঁকা মাঠের মাঝে সবুজ

আমার আত্মকথা

গাছ পালায় ঢাকা কৃষিক্ষেত্রের স্বপ্ন, সেইখানে গো-ঘণ্টা-রণিত গাঢ় সন্ধ্যার সোণালী কুহকে কবিতা লেখা ও বহুদিনের বিস্মৃত প্রণয়িনীর সঙ্গে হঠাৎ মিলন। তখন কে জানতো সে কৃষিক্ষেত্রে আলু পটলের বদলে গজাবে বোমা, সে আকাশ কুসুম ফাটবে স্বপ্নাচ্ছন্ন দেশকে জাগিয়ে আগুনের হলকায় দিক কাঁপানো নিনাদে, সে প্রণয়িনী আসবে ফাঁসীর কাঠ হয়ে মৃত্যুর সুরাপাত্র হাতে, নিয়ে যাবে আমায় হাজার মাইল কালাপানি পারে কোন এক হরিত দ্বীপে দ্বাদশ বৎসরের একান্ত বাসের জন্য। এমনি আলাদীনের দীপ জ্বালিয়ে হয়েছিল আমার এ জীবনের ভানুমতির ভেল্কির আয়োজন।



সতের

খুব দূর পথে প্রবাস যাত্রা সেই আমার প্রথম। বি এন্ আর-এর বোম্বাই মেলে বারশ' মাইল পথ—মেদিনীপুরে শালবনীর ঢেউ খেলান মাঠ, চিল্কা হ্রদের রজত মায়া, সিংহাচলমের কূর্ম্ম পৃষ্ঠ, ইনাৎপুরীর টানেল ও বনকুন্তলা গিরিবালাদের মেলা, বোম্বাইএর বিচিত্র জনসমারোহ ও তার পর বরোদা। পরেও এ পথে বার বার গিয়েছি এসেছি, কিন্তু এমন অজানার পথের ভয় বিস্ময় আনন্দ পুলক নিয়ে আর কখনও যাইনি। ষ্টেশন থেকে রিকশ'তে করে বেরিয়ে বরোদা কলেজের গুম্বজওয়ালা প্রকাণ্ড প্রাসাদ বাঁয়ে ফেলে সহরের দিকে যাত্রা করলুম। যখন মহারাজার অতিথি হয়ে সিষ্টার নিবেদিতা বরোদায় এসেছিলেন তখন বড় বড় রাজকর্ম্মচারীর সঙ্গে শ্রীঅরবিন্দ তাঁকে সম্বর্দ্ধনা করে আনতে যান। এইখানটায় এসে কলেজের বাড়ী দেখে নিবেদিতা বলেন "what an ugly pile—কি কদাকার স্তূপ", আর তারপর

একটু খানি এগিয়ে পুরাণো ভারতীয় ষ্টাইলে গড়া গৃহস্থের ছোট্ট বাড়ী দেখে বল্লেন, "oh ! how beautiful, আহা কি সুন্দর !" কলাজ্ঞানে ক' অক্ষর গোমাংস হ্যাটকোটধারী রাজ-অমাত্যরা তো অবাক ! এত লাখ লাখ টাকার মিনার গুম্বোজওয়ালা বাড়ী হলো কদাকার আর একটুখানি কুঁড়ে হলো সুন্দর ! একজন তো অরবিন্দের কাছে এসে কানে কানে বলেই ফেললেন, "I say, she is mad !" "ওহে ! উনি তো পাগল !" সেজদা' অরবিন্দ তখন বরোদা কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল কি মহারাজার প্রাইভেট সেক্রেটারী তা' আমার স্মরণ নেই, সেটা কিন্তু ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়, কারণ যে পদে যেখানেই সেজদা' থাকুন তাঁর সাহায্য ও পরামর্শ বিনা গায়কোবাড়ের একদিনও চলতো না। মহারাজার লক্ষ্মীবিলাস প্রাসাদ থেকে অল্প দূরেই কলেক্টর 'নায়েব স্ববা খাসি রাও'এর প্রকাণ্ড দোতলা লাল ইটের বাড়ীতে অরবিন্দ তখন থাকতেন। বরোদার ইঙ্গভারত রাজ অমাত্য সমাজে তাঁর তখন অসীম প্রভাব, বন্ধুরা সব মেজাজে ও বেশ ভূষায় সাহেব, অধিকাংশই বিলাত ও য়ুরোপ ফেরতা finished gentleman। তাঁদের কেতাদুরস্ত সভ্য সমাজে অকস্মাৎ অতি প্রত্যূষে উদয় হ'লো এক অদ্ভুত জীব ময়লা সার্ট ও ধুতি পরা, ছেঁড়া ক্যাম্বিসের ব্যাগ হাতে, ততোধিক ধূলো ময়লামাখা ক্যাম্বিসের জুতো পায়ে এক ভবঘুরে যুবক, চোখে তার নেশা, তাজা প্রাণে অনন্ত আশা, দুনিয়া তার কাছে অর্দ্ধেক রাজ্য ও রাজকন্যা লোভী রাজপুত্রের স্বপ্নের মত আর চেহারা ও বেশভূষা

তো ঐ রকম সৃষ্টিছাড়া লক্ষ্মীছাড়া বেদেমার্কা। সেজদার খানসামা তো আমায় দেখে অবাক! 'ঘোষ সাহেবকা ভাই' শুনেও বোধ হয় তার চটক ভাঙ্গল না, বিশ্বাস হ'লো না, নীচেই আমাকে বাহিরের ঘরে বসিয়ে রেখে সে চললো ওপরে খবর দিতে।

সেজদা' বেলা আটটা অবধি তখন ঘুমোতেন, তিনি সশব্যস্তে এসে "একি তুমি এখানে, এ ভাবে! শীগ্‌গির বাথরুমে যাও, কাপড় ছাড়ো, কাপড় ছাড়ো" বলে আমায় ঠেল্‌তে ঠেল্‌তে ওপরে চালান করে দিলেন, যাতে সেই উদ্‌ভ্রান্ত প্রেমিকের অবস্থায় খাসি রাও ও মাধব রাও-রা আমাকে দেখে না ফেলেন। সাবান ও তোয়ালের সাহায্যে চার দিন ও চার রাতের কয়লার গুঁড়ো এবং ধূলোর খোলসটি ত্যাগ করে সেজদার একটা সার্ট ও ও ফরসা ধুতি পরে বাবরি চুলটা রাবীন্দ্রিক কেতায় আঁচড়ে যখন বাইরে এলুম তখন সবাই কথঞ্চিৎ আশ্বস্ত, ক্রমে ক্রমে dining roomএ যাদব ভ্রাতার সঙ্গে দেখা। খাসি রাও "Well young man" ইত্যাদি সাহেবী সম্ভাষণে আমায় মাতব্বরী চালে পিঠ চাপ্‌ড়ে সম্বর্দ্ধনা করে নিলেন। মাধব রাও কোন দিনই ততখানি সাহেব হতে পারেন নি, বরোদা সেনা বিভাগের একটি রেজিমেণ্টের এডজুট্যাণ্ট এই শ্যামবর্ণ শান্তশ্রী দেখন-হাসি মানুষটী প্রথম দর্শনেই আমার বন্ধু হয়ে পড়্‌লেন, সেটা বলাই বাহুল্য।

তারপর আরম্ভ হলো বরোদার নতুন জীবন যার সম্বল হ'লো কবিতা লেখা, নভেল পড়া, সঙ্গীবাগ আর শিকার। সেজদাকে

অনেক ইঙ্গিত-ইসারা দিয়েও বাঁকিপুরের চায়ের দোকানের জন্তে টাকা বের হ'লো না, তিনি স্পষ্ট 'হাঁ' 'না' কিছুই না বলে 'বোবার শত্রু নেই' নীতিটি অনুসরণ করে যেতে লাগ্‌লেন। টাকার সম্বন্ধে সেজদা'র কস্মিন কালে মায়া ছিল না, কিন্তু যেটা পছন্দ করতেন না সেটার সিদ্ধির উদ্দেশ্যে উপুড়হস্ত হবার পাত্র তিনি নন। ব্যাপারখানা বুঝে আমি দোকানী জীবনের যবনিকা তোলার আশায় জলাঞ্জলি দিয়ে বরোদায়ই বসে রইলুম। রাঙা মা আমার সেখানে আশা-নিরাশার উৎকণ্ঠায় একা পড়ে তাঁর হারানো চোখের মণিটিকে মোরিয়া হয়ে বার বার করুণ পত্রাঘাত করতে লাগলেন।

ইতিমধ্যে বাঁকিপুরে প্লেগ আরম্ভ হ'লো। বর্দ্ধমান থেকে আনা চাকরটি প্লেগ হয়ে সেই বিদেশ বিভূঁইয়ে মৃত্যুমুখে পড়লো, মা প্রাণের মায়া ত্যাগ করে তার সেবা-শুশ্রূষায় বসে গেলেন। তখনকার অবস্থা সহজেই অনুমেয়। প্রকাণ্ড ব্রাহ্ম দোকানদার আমাদের ভাঙা দোকানের প্রাপ্য টাকা নিত্য তাগাদায়ও দিচ্ছে না, সহরে ভয়াবহ প্লেগের ত্রাস, ঘরে ঘরে কান্নার আকাশ ফাটা রোল, হাজারে হাজারে মানুষ দেশ ছেড়ে পালাচ্ছে। ঘরে প্লেগের রুগী শুয়ে আছে, বন্ধু আত্মীয় বলতে কেউ কোথায়ও নেই, তাঁর অন্ধের যষ্টি সন্তান বার-চোদ্দ শ' মাইল দূরে বরোদায়। এই সব খবর পেয়ে সেজদা'কে অনেক বলেও ফেরবার রেল ভাড়ার টাকাটুকুও যখন আমি পেলুম না, অগত্যা তখন কলকেতায় বন্ধু সুরেনকে তার করে দিলুম।

একদিন চাকরটি মারা গেল। অতি কষ্টে তার সৎকারের ব্যবস্থা করে এক বস্ত্রে মা গিয়ে পাল বাবুর শরণ নিলেন, তাঁরা প্লেগের ছোঁয়াচের ভয়ে মাকে উঠানের দুয়ার অবধি ছাড়া আর বেশি ঢুকতে দিলেন না। সৌভাগ্য ক্রমে ইতিমধ্যে সুরেন আমার ও মায়ের তার পেয়ে এসে মাকে কলকেতায় নিয়ে গেল। এইভাবে আমাদের বাঁকিপুরী দোকানী জীবনের পালার ট্র্যাজিডি সর্ব্বস্বান্ত দশার মধ্যে সাঙ্গ হলো আর আমার বরোদার আয়েসী কাব্যি জীবনের হ'লো আরম্ভ।

বরোদার বাড়ীর অন্দরের দিকে একটি ঘরে পড়লো আমার আস্তানা। সেইখানে কবিতার খাতা, এস্রাজ, বাগানের সরঞ্জাম আর নভেলের কাঁড়ি নিয়ে আমি পাতলুম নতুন করে আড্ডা। দুপুর বেলা খাওয়া-দাওয়ার পর আর রাত্রে খানিকটা সময় সেজদাও এইখানে আমার ঘরে এসে গল্পগাছা করে যেতেন। যখন দিদি ও বৌদি' বরোদায় থাকতেন তখন তাঁরাও সেই দলে ভিড়ে নীচেই দুপুরের শান্ত কপোত-কূজিত বেলাটুকু কাটিয়ে দিতেন। বাড়ীর পিছনে আস্তাবলের কাছে অনেকটা জমি খালি পড়েছিল, সেইটুকুকে বাঁশের ও বাঁকারীর বেড়ায় ঘিরে নিয়ে আমি কপি, কড়াই সুঁটি ও বিট গাজরের বাগান করে নিয়েছিলুম। আমাদের বাড়ীর এই দিকটার পাচিলের ও-পারে বস্তির মাঝে একঘর লোক ছিল; তারা ভাই, বিধবা বোন ও বড় ভাইএর বউ ও তার কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ক'জনায় মিলে খড়ের কুঁড়েয়ই সংসার পেতেছিল। এই পেটরোগা খোঁড়া ভাই

ছিল আমার বাগানের মালি আর শিকারের সঙ্গী। তার ফরসা ছিপ্‌ছিপে বোনটির ছিল তরুণ সৌখীন বাঙালী বাবু আমার ওপর ভারি লোভ, ঘর সংসারের কাজের অছিলায় সে বার বার ঘর-বাহির করতে শুধু আমাকে ঐ ফাঁকে দুচোখ ভরে দেখবার জন্যে। বৈধব্যের নিরস গৃহকর্ম্মরত এক ঘেয়ে জীবনে সে বোধহয় ঠিক মনের মানুষ কখনও পায় নি, ধনী বাঙালী যুবকের রহস্যময় অজানা সঙ্গ তার প্রাণকে হাতছানি দিয়ে সদাই ডাকতো, সেই ডাকের টানের সুখে অস্থির হয়ে চঞ্চল পদে তৃষিত নেত্রে তার আসা-যাওয়া ও দুয়ার ধরে আমার দিকে চেয়ে থম্‌কে থাকার আর অন্ত ছিল না; তার মন ভোলাবার মুচকি হাসিটুকু কৃষিকর্ম্মরত আমাকেও তার দিকে না চাইয়ে ছাড়তো না। গ্রাম্য বিধবা গুজরাটী বালিকার এই নীরব আত্মনিবেদন আর আমাদের দু'জনের ব্যর্থ ব্যাকুল চাওয়া-চাওয়ি সেই ভাঙা পাঁচিলটাকে আড়াল করে কি গুঞ্জনই তুলতো!

এক এক দিন খুব ভোরে চারটের সময় উঠে আমি বের হতুম শিকারে। মাধব রাও আমাকে একটি ব্রিচলোডিং বন্দুক ও একটা ছোট্ট স্পোর্টিং রাইফেলও দিয়েছিলেন। একটা বেতের বাস্কেটে চায়ের সরঞ্জাম ও Sandwitch নিয়ে আমরা বেরিয়ে পড়তুম মাঠের পথে। তখন হয়তো দিনের আলোর আভাষও জাগে নি, তবু শেষ রাতের অন্ধকারে আমার দূর পদধ্বনির সাড়া পেয়ে গাছের কালো তাল পাকানো ছায়ামূর্ত্তির মাঝ থেকে পাখীরা দু' একজন সাড়া দিচ্ছে ও পাখা ঝাপটাচ্ছে।

রিক্ত মাটিফাটা ধান ক্ষেতের আলে আলে এখানে ওখানে যে সব পলাশ, বাবলা বা ঘন পাতার বুনো গাছ ঝোপ হয়েছিল তার কাছে গুলি-ভরা বন্দুক হাতে আমরা চুপি চুপি এসে দাঁড়াতুম। কোথায় তাল পাকানো পাতার মাঝে তিতির ডাকছে, পাশাপাশি ঘেঁষাঘেঁষি দু'টিতে কোথায় বসে ডানা ঝাপটাচ্ছে, তা' কান খাড়া করে ডাকটি শুনে দেখে ঠাহর করতে হবে। তারপর উষার স্তব্ধ স্নিগ্ধ আকাশ ফাটিয়ে একটা বিকট শব্দ আর পাখা ঝটাপটি করতে করতে একটার ঝোপের মধ্যে ঢুকে যাওয়া এবং হাত পা ডানা গুটিয়ে আর-একটার ঢিপ করে মাটিতে পড়া। লুব্ধ শিকারীর নিষ্ঠুর মন বুঝতো না কতখানি অশান্তি ও বীভৎসতায় সেই স্নিগ্ধ প্রসন্ন নিবিড় উষাকে মলিন করে তুলছি।

রাঙা জবার মত সূর্যি পূব আকাশ রাঙিয়ে উঠলে পর আমরা পথ চলতে সুরু করতুম বাবলা গাছে ঘুঘু মারতে মারতে, পুকুরের পদ্মনাল ও পানফলের লতার মাঝে কাদা খোঁচা জলটুঙি পানকৌড়ির ছোট্ট চঞ্চল জীবনটি হঠাৎ ঘুচিয়ে দিতে দিতে, আকাশে উড়ন্ত বেলে হাঁসের পালে প্রাণঘাতী ছররা ছেড়ে তাদের দু' একটাকে লাট খাইয়ে পেড়ে ফেলতে ফেলতে। ছররা খেয়ে বুনো পায়রা পড়তো অনেকটা দূর উড়ে গিয়ে হঠাৎ হাত পা গুটিয়ে টুপ করে, কাদা খোঁচা আর উড়তো না— সেইখানেই সে পড়তো ছোট্ট তার ছাই রঙের পাখা দু'টি কাঁপিয়ে লুটিয়ে লুটিয়ে, বড় সারস পড়তো লম্বা পা দু'টো দুমড়ে

গিয়ে প্রকাণ্ড তার পাখা এলিয়ে মাতালের মত টলতে টলতে, আকাশে উড়ন্ত বেলে হাঁস পড়তো উল্টো ডিগবাজী খেয়ে ঝুপ করে। সারস বা বড় মেছো পাখীর মুমূর্ষু অবস্থায় তার রাঙা চোখে কি বিলোল ভয় ও উদ্বেগ যে দেখেছি—সে যেন একটা রঙীন স্বপ্নের সাজানো বাগান হঠাৎ লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে, যেন কোথায় লক্লকে অগ্নিশিখায় কার প্রাণ পুত্তলী সীতা পুড়ছে বলে চারদিকে উঠেছে করুণ কান্নার ঝড়, যেন ভয়-সন্ত্রস্ত উনপঞ্চাশটা পাগল দারুণ প্রাণের মায়ায় ছটফট করে ছুটে বেড়াচ্ছে সেই বিলোল রাঙা চোখের টলটলে দৃষ্টিতে।

বেলা নয়টায় আন্দাজ আমরা কোন বাঁশ ঝাড়ের ছায়ায় শুকনো কঞ্চি জড়ো করে আগুন জ্বালতুম, আর ঘটিতে করে জল ফুটিয়ে চা তৈরী করে তার সঙ্গে মাংস রুটির sandwich খেতুম। তারপর শিকার করতে করতে দুপুরের রোদ মাথায় উঠলে কোন ঘন আম গাছের ছায়ায় অঙ্গ মেলে দিয়ে একটু বিশ্রাম এবং বেলা তিনটা থেকে সন্ধ্যা অবধি পুনরপি নিরর্থক নির্মম প্রাণীবধ ও টো টো করে মাঠ ঘাট বন বাদাড় নদী তীর ধানের ক্ষেত চষে বেড়ানো। বাড়ী ফিরতে হতো রাত আটটা, তখন শিকারীর ঝোলায় হয়তো মরা, আধমরা, ডানা-ভাঙ্গা, পা-দুমড়ানো এমন গোটা চল্লিশেক পাখী জমে গেছে। বাড়ীতে ফিরে ঝোলা উপুড় করবা মাত্র তারা সব খোঁড়াতে খোঁড়াতে ডানার ভরে ঝুপ ঝাপ ঝটাপট করে ঘরের কোণে কোণে ছুটাছুটি করতো। তা' দেখে দিদির মায়ার প্রাণে এত আঘাত লাগতো যে দিদি

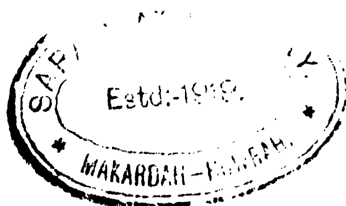
আমার এমন মুখরোচক করে রাঁধা মাংস মোটেই মুখে দিত না।

বরোদা থেকে অজয় নদী বোধ হয় ১৫।১৬ মাইল দূর, যাওয়া আসায় এই ত্রিশ মাইল হাঁটা ও খালে বিলে বনে বাদাড়ে পাখী মারার পর সে যে কি সুখনিথর শ্রান্তি ক্লান্তি নিয়ে বাড়ী ফেরা যেত, পা যখন আর উঠতে চাইছে না, এলিয়ে পড়া শরীর কেবল খুঁজছে একটা নরম বিছানা আর দু'চোখ ভরে ঘুম। তখনকার শিকারের সে পাগল টান এখন আর কল্পনায়ও ভাবা যায় না।

একদিন পাখী মারতে মারতে একদল বুনো শূয়োরের পালের সামনে পড়ে গেছলুম। কি আর করা যাবে, হাতে রাইফেল নেই, ছর্‌রা দিয়ে তো আর নারায়ণের সে বিরাট রূপকে পেড়ে-ফেলা চলে না। একদিন একদল ময়ূরীর পিছনে পিছনে ঝোপে ঝাপে লুকোচুরি খেলেও এক ঘণ্টার মধ্যে একটাকেও মারতে পারি নি। অজয় নদীর মাঝে চরে চরে সন্ধ্যার পর নানা রকম ছোট বড় মাঝারি এবং অতিকায় পাখীর এক একটা প্রায় দশ বার হাজারী ঝাঁক নামতো। তাদের কলরবে কান পাতা শক্ত হ'তো, পরস্পরের কথাবার্ত্তা অবধি শোনা যেত না। সে সময়ে চড়ার কাছে শিয়াল বা কোন বন্য পশু গেলে নাকি ঐ পাখীর দল তাকে ঠুকরে ঠুকরে সাবাড় করতো। কোন নৌকাওয়ালা মাঝিকে আমি সন্ধ্যার পর চরের কাছে যেতে রাজী করাতে পারি নি। এক একটা পাখী আকারে এত বড় যে, দেখতে উট পাখীর মত, এত ভারি যে, তারা উড়তে হলে বিশ পঁচিশ

হাত ছুটে গিয়ে তবে আকাশে উঠতে পারে ; গায়ে তাদের তীব্র আঁস্‌টে গন্ধ, পা দু'টো খুব উঁচু ও মোটা, দেহখানা দু' তিন মণ ওজনে, মাংস নাকি খুব মুখরোচক। আমার ছোট রাইফেলের গুলি তারা শরীরে নিয়ে অনায়াসে অট্টহাস্য করতে করতে উড়ে চলে যেত।

মাধব রাওয়ের দেওয়া এই রাইফেল ও ব্রিচ লোডিং বন্দুক দু'টো এনে পুজোর ছুটিতে দেওঘরেও আমি দাড়োয়া নদীর ধারে মাঠে ঘাটে পাখী শিকার করেছি। মুখরোচক পাখী মেরে এনে একটু মাখন, দু' একটা গোলমরিচ ও কিছু আস্ত গরম মশলা এবং পরিমিত পরিমাণে নুন চিনি দিয়ে Jug-soupএর পাত্রে মুখ এঁটে গরম জলে ফুটিয়ে নিতুম, সেই উপাদেয় মাংস সেজদা' খেতেন। এই পাখী ও পশু শিকারের বায়ু গিয়ে শেষ হ'লো কিনা শেষটা মানুষ শিকারের আসুরিক কাণ্ডে।



আঠার

বরোদায় স্নিগ্ধ শান্ত রসাক্ত দিনগুলি আমার জীবনে এনেছিল নিরবচ্ছিন্ন আরাম, প্রচুর অবসর, নিরিবিলি নিরুদ্বিগ্ন একটানা সুখ, মৃগয়ার উত্তেজনা, কবিতা ও উপন্যাস লেখার অনাবিল আনন্দ আর আমার ছোট্ট বাগানটির মাঝে কৃষিকার্য্যে সখটুকু মেটাবার তৃপ্তি। এর বেশী তখনকার দিনে আর বেশী কিছু আমি চাই নি। 'মিলনের পথে' তখন আমি লিখছি,—অবশ্য পরে ছাপাবার আগে ওকে খোল নলচে সমেত বদলে একেবারে নতুন করে ঢেলে সেজেছি। তবু তার প্রধান চরিত্রগুলির কাঠামো তখনকারই সৃষ্টি, পরে শুধু তাদের ওপর রঙ ফলেছে বিস্তর, দোমেটো হবার সময় একটু আধটু করে তারা বদলেছেও অনেকখানি। তখন কি যে মাথামুণ্ডু কবিতা লিখতুম তা' আর এখন একটাও বেঁচে বর্ত্তে নেই, একটা কাব্য লিখছিলুম বেশ বড় রকমের, কতকটা মাইকেলী ঢঙে, তবে অমিত্রাক্ষরে নয়।

বরোদায় আমি বোধ হয় তিনবার গিয়েছিলুম। প্রথমবার যখন যাই তখন সেখানে দিদি ও সেজবৌদি' ছিলেন না বলেই মনে হয়। তখন এবং আবার যখন দিদি বৌদি' ও সেজ মামীকে নিয়ে দেওঘর থেকে পূজার ছুটীর পর বরোদায় (সেজদা'র সঙ্গে) আমি ফিরি তখনও আমাদের অবসর বিনোদন হতো প্লাঞ্চেট নিয়ে। প্লাঞ্চেট হচ্ছে দু'টো বোতামের মত পায়ার ওপর তে-কোণা কিম্বা পানের আকৃতির একটা কাঠ, তার এক দিকের ছিদ্রে একটা পেন্সিল লাগানো থাকে। কাঠটার ওপর দু'জনে হাত রাখলে ওটা ক্রমশঃ চলে এবং পেন্সিল দিয়ে লিখতে থাকে। যে শক্তি এসে হাতে ও প্লাঞ্চেটে ভর করে লেখে সে কখন বলে "আমি রামমোহন রায়," কখন বলে "আমি নিত্যানন্দ সরকারের পিসী, দত্তদের শালখের বাড়ীর বেলগাছে আছি" ইত্যাদি। টেবিল বা প্লাঞ্চেটে হাত রাখলে হাত যে আপনি চলে তা' কোন কোন ক্ষেত্রে সত্যি, কিন্তু সে শক্তি যে কি— আমাদেরই অবচেতনার খেলা বা কোন পারলৌকিক জীবাত্মা বা ভূতের কারসাজি তা বলা শক্ত। আমি এই সময় স্পিরিচুয়ালিষ্টদের বেদ মায়ার্সের প্রচণ্ড বই দু'খানা Human Personality পড়ে ফেলেছিলুম, সার কোনান ডয়েল ইত্যাদির কথাও ঢের দেখেছি, কিন্তু কাউকে ঠিক ঠিক প্রমাণ করতে দেখি নি যে এই সব খেলা সত্যিই পারলৌকিক জীবের খেলা। প্লাঞ্চেটে কিছু একটা শক্তি এসে মৃত কোন আত্মীয়ের নামে হুবহু পূর্ব্ব ঘটনা বলছে, এতে প্রমাণ হয় না যে ভূতে বা প্রেতাত্মায়



শ্রীঅরবিন্দের পত্নী স্বর্গীয়া মৃণালিনী ঘোষ

বলছে; আমাদের অবচেতনা বা উর্দ্ধচেতনায় এমন সব অলৌকিক শক্তি ও বৃত্তি আছে যার প্রকাশে অসম্ভব সম্ভব হতে পারে। টেলিপ্যাথি ও টেলিভিশন যখন আজ প্রায় সর্ব্ববাদী সম্মত ব্যাপার তখন ঐ ধরণের আরও কতনা বিচিত্র কাণ্ড থাকতে পারে এই অখণ্ড চৈতন্যময় জগতের গোপন স্তরে স্তরে।

শ্রীঅরবিন্দের 'Yoga and its Objects' বইখানা তাঁর নিজের লেখা নয়, তিনি পেন্সিল ধরতেন আর এক অদৃশ্য শক্তি এসে লিখে যেত; রামমোহন রায়ের নামে এই ভাবে আগাগোড়া বইখানি পাওয়া গিয়েছিল; যখন এই ঘটনা ঘটে তখন অবশ্য আমি আন্দামানে। বরোদায় আমরা যত জন বসতুম তার মধ্যে সেজদা' ও আমার হাতেই এইভাবে লেখা আসতো বেশী। একদিন স্বয়ং তিলক এসে নানা প্রশ্ন করে যান, তখন আমার হাতে পেন্সিল ছিল। তার আগের দিন একজন দূরদেশবাসী মারাঠার মৃতা আত্মীয়া এসে সেই মারাঠা ভদ্রলোককে বলে গেছিল তাঁদের পৈতৃক বাসভবন কোথায় কি ভাবে ভাঙা ও বাড়ানো কমানো হয়েছে; প্রকৃত ঘটনার সঙ্গে সেগুলি হুবহু মিলে গেছিল।

প্রতিদিন আমরা কি একটা যেন নেশা ও ঝোঁকের মাথায় দু'তিন ঘণ্টা ধরে এই কার্য্য করতুম এবং সেই দুই তিন ঘণ্টার মধ্যে কত রামকৃষ্ণ, ফাদার দামিয়ন, কৃষ্ণদাস পাল, কত মৃতা ভূতযোনিপ্রাপ্তা পিসী মাসী, ঠাকুরদা, বন্ধু বান্ধব এসে দেড় টাকার প্ল্যাঞ্চেটের প্রসাদাৎ আমাদের সঙ্গে আলাপ আপ্যায়ন

করে প্রাণ জুড়িয়ে যেতেন তার তো হিসাব হদিস্ ছিল না, তাঁদের কত কথাই সত্য ঘটনার সঙ্গে মিলতো না, কত আবোল তাবোল প্রলাপ কখনও আমরা অম্লান বদনে হজম করে যেতুম কিন্তু তাতে সে সব স্পিরিটদের খ্যাতি প্রতিপত্তি আমাদের কাছে যে বিশেষ কমতো তা' নয়। শ' দু'শ message পারলৌকিক বাণীর মধ্যে দশটা মিললেই ভূতযোনির ওপর বিশ্বাসের পারা অমনি চড় চড় করে পাঁচ ডিগ্রি উঠে যেত। আমাদের দেশে এবং যে কোন দেশে এত হাতুড়ে কবিরাজ ডাক্তার, এত বুজরুগ সন্ন্যাসী গণক, এত অগণ্য গুরুপুরুত যে করে খাচ্ছে তার কারণই মানুষের প্রাণের এই অন্ধ বিশ্বাস প্রবণতা। আগা এবং পাছতলার অংশটুকু ছিঁড়ে বাদ দেওয়া জীবনের এই মাঝের পাতাটুকুর অর্থ এবং রহস্য জানবার জন্যে আমাদের এমনই ব্যাকুলতা যে কোন একটা কিছু বিশ্বাস করবার জন্যে আমরা যেন ব্যাকুল হয়েই আছি। অন্ধ যেমন একটা কিছু লাঠি বা একজন কারুর হাতের ভর পেলেই তার কাছে নিজেকে ছেড়ে দিয়ে বেঁচে যায়, কালের পথে অন্ধ আমরা তেমনি কাউকে যা হোক কর্ণধার হিসেবে পেলেই বেঁচে যাই। সে শুধু কৃপা করে বললেই হ'লো যে সে সবজান্তা ত্রিকালদর্শী মহাপুরুষ।

আমাদের সত্তা হচ্ছে মেঘস্পর্শী গিরিশৃঙ্গের মত—মাটির তলায় যার মূল ও ভিত্তি রয়েছে কত না দূর অবধি স্তরে স্তরে লুকানো আর মেঘলোকের উপরে ঢাকা রয়েছে যার সূর্য্যালোকে

উজ্জ্বল ভাস্বর চূড়ার পর চূড়া; মনের উপরে স্তরে স্তরে কতই না চেতনার ভূমি উঠে গেছে ধ্রুব থেকে ধ্রুবতর আলোর এবং জ্ঞানের জগতে—অর্দ্ধজ্ঞানে অর্দ্ধ অজ্ঞানে আলো-আঁধারী এই বস্তুতন্ত্র মন যার ছায়া মাত্র। নীচের দিকেও তাই অবচেতনার মাঝে ঘুমের স্বপ্নের instinctএর কত না আবরণে মোড়া ঘুমন্ত জ্ঞানস্তর সব রয়েছে যার মাঝে হাতড়ালে ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমানের সব কিছু হারাণো ঘটনা এবং তার নিখিল রহস্য-পেটিকা খুঁজে পাওয়া যেতে পারে। এই সব গুপ্ত জ্ঞানের কোন্ ভূমি থেকে বিদ্যুৎ চম্‌কালো—কোন্ অতিমানস বা অবমানস লোক থেকে বেতারা সংবাদ মনের যন্ত্রে এসে বেজে উঠলো তা বলা অনেকখানিই জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে, স্থূলবুদ্ধি অন্ধ মানুষই নিজের মনের বা প্রাণের আকাঙ্ক্ষার সুরে মুগ্ধ হয়ে তার নাম দেয় ভূত, মির‍্যাকল্ ইত্যাদি।

নিত্য এই ভূতলোকের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া করা ছাড়া আমার আর এক কাজ ছিল—ভাঙা এস্রাজটিকে আমার কোন গতিকে চলনসই গোছের সুর বেঁধে নিয়ে মাঝে মাঝে বাজাতে বসা। ঢাকায় থাকতে মেজবৌদির বাজনা শেখাবার ওস্তাদ্ বিখ্যাত ভগবান সেতারীর কাছে আমার যৎসামান্য শেখা বিদ্যাটুকুই এই নিত্য ভাবে উদ্বেল প্রাণের ছিল একটা মস্ত বড় safety valve। জোয়ার-ভাটায় সমুদ্রের কাছাকাছি নদীগুলির অবস্থার মত অনন্তের সঙ্গে যুক্ত আমাদের এই মন প্রাণ হৃদয়ে দিনে রাতে কত না সুখ দুঃখ আনন্দ নিরানন্দের জোয়ার এবং ভাটায়

ঢেউ ও বেগ জাগছে ; সংসারে আমরা সেগুলি কাটাবার ভোগ সামগ্রী—স্ত্রী পুত্র আত্মীয় বন্ধু পাই বলেই ক্ষেপে যাইনে। কলা শিল্প সঙ্গীত এ সব হচ্ছে রূপ ও রস জগতের জোয়ারের তরঙ্গ, ঐ পথে তারা এই স্থূল জগতে নেমে আসে। গুটি দশ বার গৎ ছিল আমার সম্বল আর ছিল সস্তা স্বরলিপির বই ; তাই নিয়ে আমার সঙ্গীতচর্চ্চা অদম্য উৎসাহে দিদি ও বৌদিকে মুগ্ধ করে অবাধে চলতো। আসলে বাজনাটা তবু তাল সুর কেটে কোন গতিকে বাজাতে পারলেও কণ্ঠসঙ্গীতে আমি ছিলুম একটি আস্ত "পদ্ম আঁখি আজ্ঞা দিলে আমি পদ্ম বনে যাব" জাতীয় জীব। প্রাণভয়ে আজও আমি লোকালয়ে বিশেষতঃ রজকালয়ের কাছাকাছি কখনও গলা ছেড়ে গান গাই নি, এতটুকু বুদ্ধি ও আত্মজ্ঞান আমার আছে।

বিকেলের দিকে বরোদার পার্কে বেড়াতে যেতুম, রাজ-পুরাঙ্গনারা আঁটসাঁট বন্ধ ঢাকা ব্রুহামে বা মটর কারে বস্তাবন্দী হয়ে ব্যাণ্ড শুনতে আসতেন। দু' চার জন তন্বী গৌরাঙ্গী পার্শী মেয়ে হাত ধরাধরি করে ছেলেদের মধ্যে রূপ ও লাবণ্যের টানা ও পোড়েন দিয়ে দিয়ে পায়চারি করতেন, দর্শকদের মুগ্ধ প্রাণের তাঁতে মোহের সূক্ষ্ম চিনাংশুকখানি বুনতে বুনতে। রূপ-ক্ষুধাতুর চোখে এই সব দুর্ল্লভ মেনকা তিলোত্তমাদের চেয়ে চেয়ে দেখাই ছিল তখনকার দিনে একটা মস্ত দরকারী কাজ, যেদিন পার্কে যাওয়া বাদ পড়ে যেতো সে দিনটা বুকের মাঝে একটা খাঁ খাঁ করা শূন্যতা রেখে যেত। আসলে প্রথম যৌবনে

যতদিন নারী-সঙ্গসুখ অদৃষ্টে ঘটেনি ততদিন দিল্লীকা ল'ড্ডুর পশ্চাতে ছোটার এই অবস্থাটি যে কি পর্য্যন্ত প্রাণান্তকর ছিল তা' ভুক্তভোগী মাত্রেই জানেন; একে তো পর্দ্দা ও ঘোমটায় ঢেকে নারীকে করে রাখা হয়েছে দুর্ব্বার মোহের বস্তু, তার ওপর ঐ বয়সটিতেই প্রথম বসন্ত স্পর্শে রসাপ্লুত নব-মুঞ্জরিত প্রাণ আমাদের হ'য়ে ওঠে একান্তই লোভী ও ক্ষুধাতুর। তখন যে দু'চারটি মেয়ে দৈবাৎ চোখে পড়েন তাঁদের রূপ দূর থেকে গো-গ্রাসে গেলা ছাড়া আমাদের দেশের যুবকদের উপায়ান্তর থাকে না, তাদের দেখেও যতখানি বিড়ম্বনা না-দেখেও ততখানি।

যে সব দেশে নারী ও পুরুষের সম্বন্ধটা যৌনভয়ে এমন আড়ষ্ট নয়, ছেলেবেলা থেকে যে দেশের ছেলে মেয়ে সহজ-ভাবে মেলা-মেশা করতে পায়, সে সব দেশে গা-সওয়া হয়ে নারী তার মোহিনীরূপ ত্যাগ করে কতকটা কেন অনেকটাই সহজ হয়ে দাঁড়ায়, পুরুষের চোখে সেও হয় দোষে গুণে নিতান্তই সাধারণ মানুষ, রহস্যে ঘেরা আমাদের দুষ্প্রাপ্য চাঁদা মামা নয়। কৈশোরে ও প্রথম যৌবনে ছেলে মানুষী ভাবে দু'চার বার প্রেমে পড়ে হৃদয় হারিয়ে ঘা খেয়ে খেয়ে সে সব দেশের পুরুষ যখন উঠে দাঁড়ায় তখন তার মোহের ঘোর অনেকটা কেটে গেছে, সে একটা সহজ ছন্দ ও balance পেয়ে সতর্ক হয়েছে, হৃদয়াবেগ ধারণ ও সংযত করবার কৌশল আয়ত্ত করেছে। আমার জীবন দিয়ে বাঙালীর ছেলের নারী-বঞ্চিত জীবনের হাহাকারটার ইতিহাস এবং সুফল ও কুফল বেশ পাঠ করার

সুযোগ ঘটে। কারণ, নানা ঘটনা চক্রে পড়ে নারীর সঙ্গে চরম সম্বন্ধটি আমার সারা যৌবনটা পেরিয়ে ৪৬।৪৭ বৎসর বয়স অবধি ঘটে নি। অথচ আমার দেহে মনে প্রাণে তার প্রয়োজন, তার লিপ্সা ও ক্ষুধা, তার ডাক এত প্রবল ছিল যে, সে তীব্রতা আমাকে কবি করে ছেড়েছিল। রসায়ন শাস্ত্রে সোণা তৈরী করতে হ'লে, মকরধ্বজ তৈরী করতে হ'লে নানা ধাতু ও উপাদান মিশ্রিত রসকে যেমন বহুক্ষণ ধরে—কতই না দিবা-যামিনী আগুনে পাক করতে হয় মানুষের হৃদয় মন প্রাণের রস-বস্তুকেও তেমনি অনির্ব্বাণ রাবণের চিতার মত আগুনে ফেলে দীর্ঘকাল পাক না করলে তা' থেকে কবিত্ব ও প্রতিভার অমন সোণালী বস্তুটি লাভ হয় না। এক এই কারণ ছাড়া আমাকে এতদিন ধরে নারী সংসর্গ থেকে উপবাসী রাখার আর কোন সার্থকতা আমি দেখি নে।

আমার স্বভাবে নারীকে দুর্ব্বার টানের বস্তু করবার কত যে উপাদান ও কারণ আমার জীবনে বর্ত্তমান তা' একবার ভেবে দেখুন। প্রথম, জন্মাধিকার সূত্রে প্রবল কামশক্তি আমি পেয়েছিলুম। দ্বিতীয়, আমার কবিত্ব শক্তি যা মানুষের চোখে সুন্দরকে নানাভাবে দেখায় তার রহস্যময় আবরণটি পরদায় পরদায় তুলে, তার অবগুণ্ঠন সরিয়ে সরিয়ে। রূপ, সুষমা ও আনন্দের কুবের ভাণ্ডার এই জগতে থরে বিথরে কত যে অপর্য্যাপ্ত সাজানো রয়েছে তা' সহজ সংসারী মানুষ সাদা চোখে সব দেখতে পায় না, সে সব নিঃশেষে দেখতে পায়—কেবল

সেই·সুন্দরের ঋষি যার চোখে জ্ঞানের ও কবি-প্রতিভার অঞ্জন বিধাতার তুলির টানে জন্মাবধি মাখানো রয়েছে।

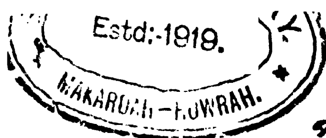
তৃতীয়তঃ, আমি হচ্ছি স্বভাবতঃ রাজসিক পুরুষ, রজঃশক্তির বিপুল উৎস বুকে ও নাভিমূলে নিয়ে আমার জন্ম ও জীবনধারণ, যার বেগ বোমা থেকে আরম্ভ করে এতগুলি অসাধ্য সাধনের দিকে সারাটা জীবন আমাকে ক্রমাগতঃ ঠেলে নিয়ে গিয়েছে। আগেই বলেছি বাল্যকালে আমারই খেলার সাথী মাসতুতো ভাই হুপো বা অবিনাশ যে অসংযমের ফলে albumeneria হয়ে মারা গেল আমি ঠিক ততখানি অসংযমের মুখেও এই ক্ষীণ দেহ যষ্টিখানি অটুট রেখে বেরিয়ে এলুম। তার পরেও সারা বয়সটা জুড়ে নারীর আশায় আশায় কম শক্তিক্ষয় হয় নি, তবু কিন্তু এ শরীর ভাঙলো না। এক একবার মত্ততায় ক্লান্তিতে বহু দিন-রজনী কাটিয়ে যখন উঠেছি তখন বোধ হয়েছে এইবার বুঝি দেহ যায় কিন্তু দু'চার দিনে এমন বল ও স্বাস্থ্য কোন্ অদৃশ্য প্রাণ সমুদ্রের মোহানা থেকে কুল কুল বেগে বয়ে এসে শ্রান্ত দেহ মনকে সজীব করে তুলেছে যে, আমি নিজেই আশ্চর্য্য হয়ে গেছি। এ থেকেই বোঝা যায় আমার রাজসিক ধাতুতে গড়া দেহ-প্রাণের স্বাভাবিক তেজ ও শক্তির পরিমাণ অপরিমেয়।

খুব বড় করে জ্বালা আগুনের কুণ্ড যেমন কলাগাছটাও নিজের তেজে ভস্ম করে শত অম্লান শিখায় জ্বলতে থাকে তেজস্বী প্রাণবান পুরুষরাও হয় ঠিক সেই রকম। যে রূপমুগ্ধ ভোগলোলুপ দুর্ব্বার প্রাণশক্তি নারী ও সুরার মাঝে কবি

চিত্তরঞ্জনকে ভোগবিলাসী করে রেখেছিল সেই শক্তিই মুহূর্ত্তের আবেগে ঊর্দ্ধমুখী হয়ে তাঁকে করে তুললো সর্ব্বত্যাগী দেশবন্ধু। যেখানে সব চেয়ে উঁচু আকাশস্পর্শী গিরিচূড়া নিজ মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে তারই পাশে থাকে পাতাল-ছোঁয়া অতলগর্ভ খাদ। তাই শাস্ত্রে বলে 'তেজিয়াংশ্চ ন দোষায়'। তাই মানব জীবনের ইতিহাসের পাতায় এত বড় বড় কবি, দেশকর্ম্মী, বীর ও চিত্রকরদের পাই এতখানি উচ্ছৃঙ্খলতার প্রতিমূর্ত্তি রূপে। তাঁরা উদ্বেল তরঙ্গমুখর প্রাণসিন্ধু বুকে ধরে তার বেগ সব সময় সামলাতে পারবেন না সেটা কি খুব বেশী আশ্চর্য্য ব্যাপার? ক্ষুদ্রপ্রাণ ক্ষুদ্রশক্তি মানুষের পক্ষে শাস্ত্রভয়ে লোকভয়ে বিধি-নিষেধের ভয়ে গোপাল সুবোধ বালক সেজে চলা সহজ. কারণ—তাদের পিছনে খুব বড় শক্তির তাড়া নেই, ভাল বা মন্দের ক্ষুধা তাদের একটুখানি।

যাই হোক, এই প্ল্যাঞ্চেটী ব্যাপারে ক্রমশঃ আমাদের জীবনের নদীপথে তরীখানি বাঁক নিয়ে আবার অন্য পথে চলবার আয়োজন করে নিলো। রামমোহন কি বিবেকানন্দ বা অমনি কে এসে ক্রমাগতঃ বক্তৃতা দিয়ে আমাদের উত্তেজিত করতে লাগল দেশে নব আনন্দমঠে সন্তান-সেনা গড়বার জন্যে। তখন মহারাষ্ট্রের গুপ্তসমিতির নেতা ঠাকুর সাহেব জাপানে, গুজরাটের গুপ্তচক্রের দেশপতি (প্রেসিডেণ্ট) বরোদায়ই আছেন। তাঁর কাছে আদেশ পেয়ে বরোদা সেনা-বিভাগের কাজ ছেড়ে দিয়ে যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কলকেতায় চলে গেছেন এবং সেখানে

গুপ্ত-সমিতি গড়ে তুলেছেন। আমার ডাক পড়লো বাঙলা দেশের তরুণদের ও ছাত্র-সমাজের মনের ভূমিতে স্বাধীনতার বীজ বপন করবার জন্যে; যতীনদা' কয়েকজন মাতব্বর ধরে টাকারই নাকি ব্যবস্থা করতে পেরেছেন, তরুণদের হৃদয় জয় করতে পারেন নি। আমাকে বাঙলা দেশে গিয়ে সেইটি করতে হবে। পোষা হাতি দিয়ে যেমন করে হাতি ধরে গন্‌গনে আগুনে গড়া আমার তরুণ প্রাণের ছোঁয়াচ লাগিয়ে তেমনি তরুণ ধরবার ব্যবস্থার জন্যে গুপ্তমন্ত্রে দীক্ষা দিয়ে আমাকে দেশে পাঠান হ'ল।



পরিশিষ্ট

দেশে এলুম অপূর্ব্ব এক স্বাধীন ভারতের স্বপ্ন নিয়ে; এইখানে "আমার আত্মকথা"র প্রসঙ্গের পরিসমাপ্তি আর "বোমার কথা"র আরম্ভ। যাঁরা এই দুই শ' পৃষ্ঠাব্যাপী আত্মকাহিনী মন দিয়ে পড়েছেন তাঁরা এই মানুষকে তার রক্তরাঙা বিপ্লব প্রচেষ্টার মাঝে চিনতে পারবেন কিনা সন্দেহ। যে ভাবুক খেয়ালী মানুষ বাবরী চুল রাখে, অতি সযত্নে ঢেউ খেলানো টেরি কাটে, নাগরা জুতা পায়ে দেয়, দেওঘরের পাহাড়ে বসে রবিয়ালী ভাষায় ও ভাবে প্রেমের কবিতা লেখে, বাঁকিপুরে গিয়ে মনোহারী দোকান ও চায়ের ষ্টল খোলে, আবার এক কথায় সেই দোকান তুলে দিয়ে বার শ' মাইল দূরে গুর্জ্জর দেশে পাড়ী জমায়, সে মানুষ হঠাৎ কেন এমন একটা বীভৎস গুণ্ডামীর কাজে হাত দিল? রবীন্দ্রনাথ যদি কাল শান্তিনিকেতন ও কবির মধুমাখা কলম ছেড়ে রাতারাতি বিশে ডাকাতে পরিণত হন আর গালপাট্টা রেখে মালকোচা মেরে ঠ্যাঙ্গা হাতে অন্ধকার গলির মুখে মেছো বাজারে মানুষ ঠ্যাঙ্গাতে নামেন তা' হলে সেটা একটা বিপরীত কাণ্ড হয় না কি? শুধু আমিই নই আমার মত হাজার হাজার নির্ব্বিরোধ নারীর অধিক কোমল প্রকৃতির মানুষ রাজনীতির পাল্লায় পড়ে ঠ্যাঙাড়েয় পরিণত হয়েছে। এই অদ্ভুত কাণ্ড কেন ঘটলো তার কারণ আমি যথাসাধ্য বিশদ করে "বোমার কথা"র মুখবন্ধে বলেছি।

প্রাণ দিয়ে দেশকে বড় করবো, এ স্বপ্ন আমার আজও প্রাণ মনকে মাতিয়ে তোলে, কিন্তু রক্তপাত আমার কাছে কোন কালেই রুচিকর নয়। মানুষের দুঃখে রোগে ব্যথায় বিপদে এত শীঘ্র কেঁদে ওঠে যার হৃদয় ও প্রাণ তার পক্ষে নিরপরাধ মানুষকে তার স্বজাতির অপরাধে প্রাণে মারতে যাওয়া কি কখন আনন্দদায়ক হতে পারে? আমি ছিলুম আনন্দের পোকা, জগৎ ছিল আমার চোখে রসের খনি, কি স্বদেশী কি বিদেশী প্রত্যেক মানুষ ছিল তারুণ্যে উন্মুখ আমার কাছে আরব্য উপন্যাসের নায়ক নায়িকা। কবিতা লেখা আর প্রকৃতির হরিত কোলে কৃষি উদ্যান রচনা করার ঘোরাল স্বপ্ন দেখতে দেখতে আমার এই ভাবে একটা খুনাখুনির মাঝে নামাটা আপাত চোখে বিসদৃশ ও ছন্দপতন মনে হলেও হয়তো পরাধীনতার ব্যথায় আতুর দেশে ঐ রকমই হয়। কত নিপীড়িত পর-পদদলিত দেশে কত কবি শিল্পী ভাবুক প্রেমিক নিষ্ঠুর হয়ে উঠেছে দেশের দরদে, এই মুক্তির পাগল করা স্বপ্নে। ভারতের এই দুর্দ্দিন কেটে গিয়ে জগতে মানুষের মুক্তির যুগ এলে ইংরেজও একদিন বাংলা দেশের এই পাগলামিকে শ্রদ্ধার চোখে দেখবে। আজ রাজনীতির অন্ধ ঝঞ্ঝায় ইংরাজ ও বাঙ্গালী সমান অন্ধ, আপন পর জ্ঞান তাদের হারিয়ে গেছে, এক মানবতার উদার প্রেম সে তো বহু দূরের কথা। তাই আমাদের সুকৃতি দুষ্কৃতির প্রকৃত হিসাব করবার দিন এখনও হয়তো আসে নি।

কিছু দিন বাঙলা দেশে ব্যর্থ বিপ্লব প্রচেষ্টা করবার পর

যতীনদার সঙ্গে গৃহ বিবাদে আমাদের কেন্দ্রটী ভেঙে যাওয়ায় আবার সেই বরোদায় আমি সেজদা'র সঙ্গে ফিরে যাই। সেখানে আবার কিছু কালের জন্যে আরম্ভ হ'লো সেই শান্ত সুখ-নিবিড় নিরালা জীবন, সেই শিকার, কবিতা চর্চ্চা ও সঙ্গী-বাগ। তখন আমি বোধ হয় 'মিলনের পথে' লিখছি। আবার আমাদের প্লাঞ্চেট নিয়ে ভূতের রিসার্চ্চ আরম্ভ হলো। এবার কে একজন অনৈসর্গিক জীব রামমোহন না বিবেকানন্দ অমনি একজনের নামে এসে আমাদের ক্রমাগত উত্তেজিত করতে লাগলো দুর্গম বনে পর্ব্বতে 'ভবানী মন্দির' গড়বার জন্য। এই মন্দিরে দীক্ষাপ্রাপ্ত সমর্পিতপ্রাণ কর্ম্মী সব বাংলা দেশে গড়বে অনুপম এক মুক্তির পীঠস্থান।

আমার প্রাণ ও হৃদয় সত্তার মাঝে আছে যে এক কবি, অতি বালক কাল থেকে যার খেলাই নানা ঘোরাল রসাল স্বপ্ন নিয়ে। খুব ছোট বেলা ১৪।১৫ বছর বয়সেও আমার মনে আছে প্রাণের মাঝে জাগতো একটা প্রবল বেগ, একটা আকুল ঊর্দ্ধ দৃষ্টি, বড় কিছু হবার অদম্য স্পৃহা। দিন যেন আমার বৃথা বয়ে যাচ্ছে, কি যেন একটা বৃহৎ ও সার্থক আয়োজন করতে হবে, এক দিনের বা পাঁচ দিনের বিলম্বে যার বিমল শুভ্র সৌধ নীল আকাশ ছুঁয়ে বুঝি আর উঠবে না। এই চঞ্চল উচ্চাকাঙ্ক্ষার বেগে আমি আমার চার পাশের মানুষকে চিরদিন তাড়িয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি; আমি চলেছি আপন স্বপ্নে নিজের বেগে আর তারা আমাকে ঘিরে জটলা করে চলেছে আমার তাড়ায়। তাদের মধ্যে হয়তো

সবাই চায় নি কিছু, কিন্তু তবু আমার ডাকের টানে আমার আশার ছোঁয়াচ লেগে তারাও না চেয়ে পারেনি।

ছেলে বেলায় দরিদ্রের সেবার স্বপ্ন, নিষ্কলঙ্ক নৈতিক জীবন গঠনের স্বপ্ন, তারপর সাহিত্যের রসের আয়োজন, দেশপ্রেমে বিশ্বজয়ী বীর হবার কামনা ; তার পরে কৃষি, দোকানদারী, বরোদার জীবন ; অবশেষে রাজনীতির ঘূর্ণিপাক, বিপ্লবের রক্তচুল্লী, সব শেষে ধর্ম্মের নেশা—দিব্য কোন্ পরম জ্যোতির্লোকের অভিমুখে জয়যাত্রার অভিযান। সব গিয়ে এখনও আছে ঐ সবেরই কিছু কিছু ভগ্নাংশ, বুঝি সব কয়টি মিলে হয়েছে জগতে মানব সমাজে এক উজ্জ্বল সুসমঞ্জস সত্যলোকের আবির্ভাবের স্বপ্ন। আমার তো বোধ হয় চেষ্টা করলে সত্যই এটা হয়, এই ভাঙা-চোরা বিসদৃশ অর্দ্ধোন্মাদ জগতের দিকে চাইলে অবশ্য এই উপাদান নিয়ে সেটা যে খুব সম্ভব ও খুব সহজে কার্য্যকরী তা' মনে হয় না বটে কিন্তু অন্তরের সেই ধ্যানস্তিমিত স্বপ্ন পুরুষের দিকে চাইলে সমস্ত সত্তা গর্জ্জে ওঠে, "এযে অনিবার্য্য, ওরে মন হবেই হবে।"

জগতে প্রচুর অন্ন বস্ত্র, প্রচুর ভোগোপকরণ ও আনন্দ সম্ভার থাকতে মানুষ কি চিরদিনই করবে কোটীপতি আর চিরকন্থাধারী ভিখারীর অভিনয়? সামনে অন্নকূট সাজিয়ে চিরদিনই এমনি করে তারা হাজারে হাজারে লাখে লাখে মরবে মর্ম্মান্তিক ক্ষুধার তাড়নায়? সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর মানুষের শতকরা নব্বই জন হয় গৃহহারা আর নয়তো পর্ণকুটীরবাসী। ভগবান যাকে চারদিকের বাঁধন খুলে মুক্ত করে দিয়েছেন জন্ম, সে কি

এমনিই সারাটা জীবন জুড়ে করবে রাশি রাশি শৃঙ্খল রচনা আর নিজের চারপাশে তুলবে সমাজ ধর্ম্ম রাষ্ট্র ও বিধির কারা-প্রাচীর ? একি বিসদৃশ ব্যাপার বল দেখি ? মানুষ কি সর্ব্ব সংস্কার বিমুক্তির পরম নিশ্চিন্ততায় আবার ফিরে যেতে পারে না ? দশজনকে নিয়ে সে কি সুখী হতে ভুলে গেল ? মানুষের অন্তর্নিহিত দেবত্বের নিরুপম ছন্দটি কি এমনি করে একেবারে হারিয়ে গেছে ! আজও তাই মনে হয় আর একবার বের হই সর্ব্ব বিমুক্তির বাণী নিয়ে, প্রেমের—মহামানবতার আদর্শের—মশাল হাতে আর একবার জীবনের শেষ নিঃশ্বাস নিয়ে করি অভিযান—মানুষকে মানুষ করবার জন্যে মানুষেরই বিরুদ্ধে অভিযান।


SARASWAT LIBRARY
Estd:-1919.
MAKARDAH-HOWRAH.